শাক্যর

হিরণ্ময় ঘোষালের অন্যান্য বই :

মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি)

হাতের কাজ (গল্প-সমষ্টি)

শান্তকাঞ্চন

হিরণ্ময় ঘোষাল

অগ্রগতি পাব্লিশিং ওয়ার্কস্
পি-২১, সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৪৯।

দাম : আঠারো আনা

পি-৯১, সর্দার শঙ্কর রোডে
অগ্রগতি প্রিন্টিং ওআর্কস্ থেকে
আশু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিচয়-লিপি

যাঁরা বাঙালী-যৌবনের কিয়দংশ বিলেতে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাছে গল্পগুলি নেহাৎ নাইভ্‌ বলে মনে হবে। তবে এই কাহিনী-কটি এবং তাদের চরিত্রাবলী সম্পূর্ণরূপে কল্পনা-প্রসূত বলেই বলতে সাহসী হচ্ছি যে, তাদের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ধ্রুব। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের দেশের ছেলেদের বিলেতে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। তবে দূর দেশে গিয়ে তারা যে শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় না, এইটেই নিতান্ত আফশোষের বিষয়। নিজেদের কূপে বসে তারা আপন-আপন মনে যে এঁদো এবং অস্বাস্থ্যকর চোর-কুঠরী রচনা করে তারই দু-একটি চিত্র ছকে দেওয়া গেল।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩৫৯

হিরণ্ময় ঘোষাল

ত্রিভুজ

তিনটি চরিত্রের একত্র সমাবেশ—হিরেন, সত্যপ্রসাদ ও অমল।

হিরেন লণ্ডনে থেকে পড়া-শুনো করে। বিশ্বসংসার তার কাছে কয়েকটি বিদেশী সাহিত্যে সীমাবদ্ধ, এবং তদনুসারে তার কেশ দীর্ঘ ও চক্ষুদ্বয় অস্ফুট-প্রতিভা-দীপ্ত। নির্বাপিত আগ্নেয়-গিরির মত তার ভেতরে সামান্য কিছু তেজ থাকলেও ভবিষ্যতে অগ্ন্যুদ্গারের কোনো আশঙ্কা নেই, কারণ সে আদর্শবাদী।

সত্যপ্রসাদ কেম্ব্রিজ-ফের্তা। কেম্ব্রিজে শিক্ষা শেষ করে তার দেহটা কোনমতে ইহজগতে ফিরে এসেছে। তবে তার আত্মা বন্দী-হয়ে কেম্ব্রিজের বিচিত্রিত সভাকক্ষ ও গলবন্ধ-ভূষিত হয়ে ক্যাম্-স্রোতস্বিনী তীরে আজও হাহাকার করে ফেরে। তার ভাব-ভঙ্গী নিরতিশয় আত্মপ্রত্যয়-পরিপূর্ণ। জীবন সম্বন্ধে কোনপ্রকার অলীক স্বপ্ন পোষণ করা তার রুচি-বিরুদ্ধ।

অমলের কথা। স্রোতে-ভাসা তৃণের মত তার মন প্রবল গতিতে অনায়াসে দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করে চলে। পূর্বোক্ত উপমা থেকেই বোঝা যায়, তার নিজের মতামত বলে বিশেষ কিছু নেই, যদিও তার দৃঢ় ধারণা এই যে, তার ক্ষিপ্র-ভাসমান মনের প্রগতির জন্যে দায়ী সে একমাত্র নিজেই। মনস্তাত্ত্বিকদের সে অগ্রণী, এবং মনোবিজ্ঞানের এক চিৎপুরের গলিকে সম্প্রতি সে আবিষ্কার করেছে। জীবনের অনেক কর্তব্যই যে ব্যবহারোপযোগী, তা ভাবী ব্যবহারজীবী হিসেবে সর্বত্র প্রচার করা তার একটা মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং একথা সে কারো কাছেই গোপন করে না যে, ভারতবর্ষে সামান্য সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সে-দেশে সুরু হবে, গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ-বিচ্ছেদ। তখন মনস্তাত্ত্বিক আইনজ্ঞদের পসার বেড়ে উঠবে উল্কার মত। "উল্কা" ও "স্ফুলিঙ্গ" এই দুটি কথা অমলের কথাবার্তায় সততই উপমা-রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অথ কথারম্ভ :

হেমন্তের এক ধূম্রবর্ণ সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে লণ্ডনের ব্লুমসবেরী পল্লীর এক বোহেমীয় ধরণের বৈঠকখানায় বসে জীবনের আদিম ও অন্তিম তাৎপর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক গবেষণায় যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, তখন সত্যপ্রসাদ সেইদিনকার সমস্ত বিচারতর্ককে সোটাখানেক পাইপ-ফুৎকারে জানলা পার করে দিয়ে তার কেমব্রিজের ফরাসী উচ্চারণে বললে—আর যাই বলো ভায়া, জীবনের জিষ্ট্ হচ্ছে লেমার্মে ল্যা ফঁম্।

অমল সায় দিয়ে বলে উঠলো—ব্রাভো, এই তো চাই! কথাটা যা বললে, একেবারে ফ্লুইড! বলো তো ভাই! আমি দিন-রাত্তির এই কথাই তো বলি হিতেনকে। আর কিছুদিন এইভাবে কাটালে ও একটা শক্ত অসুখে পড়বে, এ তোমায় বলে দিচ্ছি সত্যপ্রসাদ। জানো তো ভাই, ইন্হিবিশন্ কী চীজ্!

খানিকটা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে সত্যপ্রসাদ বললে—জানি না আবার! বেঁচে থাক্ আমাদের কেম্ব্রিজের ফ্রেড্স্ আফ্টারনুন্ আউট্! বলি ভায়া হিতেন্দ্রনাথ, আর কতদিন কাটাবে এমন করে? তোমার ঐ অফারতেজের চোটে রাস্তা-ঘাটের উমা-উর্মীরা যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাও কি তোমার নজরে পড়ে না হে? কোন্দিন একটা কেলেঙ্কারী ঘটাবে দেখতে পাচ্ছি! প্রেম-স্নেহের কথা ভুলে যাও ভাই। এ বয়েসটা আমাদের চরিত্র-গঠনের বয়েস। এখনো যদি জীবনটা একটু বাজিয়ে দেখে না নিলে তো পরে এমনি ঠকানটা ঠকবে যে, সারা জীবন একটি বেকী বোশানীকে সম্বল করে কাটাতে হবে ভাই।

অমল বাহবা দিয়ে উঠলো—ক্যাপিটাল্! একেবারে ছাঁকা ফিলসফি, উঁকা! হে হে, নকল না চিনলে আসল চেনা যায় না। ঠিক বলেছ ভাই, একেবারে খাঁটি আরবী-ইরাণী মুক্তো-ব্যবসায়ীদের ভাষা। শুনছো হিতেন?

সত্যপ্রসাদ হিতেনকে চোখ ঠেরে বললে—যাবে নাকি আজ? একবার পরখ করেই দেখ না, তুমি তো আর সীতে-সাবিত্রী নও হে, যে এক কথাতেই সতীত্ব হারাবে! একী মনে রেখো,

হিতেন, আমরা পুরুষমানুষ, এবং এটা আমাদের বার্থ-রাইট্
চলো হে, আজই তোমায় বউনী করিয়ে দি। কী বলো অমল ?

উত্তেজনায় অমলের ফিন-ফিনফিনে দুটো কান পুঁইমেটুলীর
মত বেগুনী হয়ে উঠেছে। একটু ইতস্তত করে বললে—
হু-হুঁ-ও, হ্যাঁ, বউনী যদি করতেই হয় তো অবশ্য শুভস্য শীঘ্রং !
মানে, লাভ্-টাভ্, সেন্টিমেন্ট-টেন্টিমেন্ট, যা বলো, ওসব
বঙ্গেতেই রেখে আসা গেছে। ওসব আমাদের দেশের ঠুন্কো
জিনিস ; জগতে যখন বেরিয়ে পড়া গেছে তখন আমাদের
নিজেদেরও জগতের মানুষ বলেই জ্ঞান করা উচিৎ। তা ছাড়া
আমাদের জেনারেশন্টা তো একটা প্রকাণ্ড ট্র্যান্জিশনের
জেনারেশন্ ! লাইফের ভেতর দিয়ে আমাদের যেভাবে চলতে
হচ্ছে তা অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও কঠোর। যাকে বলে গিয়ে তোমার
ক্রুসিফাই ! এক পরীক্ষা-পাসের গুঁতোতেই অস্থির, তার ওপর
আবার যদি নিজের প্রাইভেট্ লাইফের ছোটখাটো প্রব্লেম-
গুলোকেও ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস্ দিয়ে দেখতে আরম্ভ করি তো
অচিরেই বেড্ল্যামে ঢুকতে হবে। তা হিতেন তুমি ভাই যা
ভালো বোঝো করো। তোমাকে আমরা ফোর্স্ করতে চাই
না। শুধু পুরোনো বন্ধু হিসেবে প্রোপোজ্ করছি মাত্র।

রোমান্টিক হিতেনের মনে তখন বসন্তের বাতাস বইতে সুরু
করেছে। ইস্কুলে পড়বার সময়ে জনৈক সহপাঠীর বোনকে দেখা-
মাত্রই সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। বীরপণ্ডিতের খাতায়
কবিতা লেখা, উল্লিখিত ব্যক্তির ইস্কুলে যাবার পিছু-পিছু সাইকেল

ফুটোনো এবং আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের যে-যে লক্ষণ সাধারণতঃ গল্প-লেখকদের চোখে পড়ে, তার একটাও তৎকালীন হিতেনের কার্যাবলী থেকে বাদ যায়নি।

ইস্কুলের পড়া শেষ করে হিতেন কলেজে ঢুকলো, এবং ডিগ্রী নিয়ে বিলাত গেল। তার কিশোর বয়েসের প্রেম তার মনের আওতায় অল্পে অল্পে বেড়ে আজ ফলফলে হয়ে উঠেছে। তাকে অতিমত্তার সূর্যতাপ বা বিচ্ছেদের চন্দ্রালোক আজও স্পর্শ করতে পারে নি। তা যেন দক্ষিণ আমেরিকার কোন্ এক নাম-না-জানা অর্কিড্, বনের গহন অন্ধকারে তার জন্ম, এবং সেই অন্ধকারের বুক-চেরা শুধু একটি লাল ফুল, কালো দেহে টাট্‌কা ক্ষতচিহ্নের মত। ইত্যাদি ইত্যাদি। হিতেনের নিজের ঢঙের ভাষা ব্যবহার করে তার মনে পীড়া দিতে চাই না।

যাই হোক্, ইতিমধ্যে হিতেনের প্রেম-পাত্রীটির কয়েক বছর আগেই এক প্রৌঢ়, পুত্রকন্যাবান্, বিপত্নীক অধ্যাপকের সঙ্গে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবং উক্ত দয়িতার নিজেরও গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে তার আঁচল ধরে গুড়-মাখা হাত চেটে "মা-মা" রবে বাড়ী মাথায় করছে। হিতেন নাকি এ-সম্বন্ধে একখানা উপন্যাসের আধখানা লিখে ফেলেছে, যার সার মর্ম এই: প্রেম অপার্থিব, বস্তু তার ছায়া মাত্র। আসল কথা, ভালোবাসার বাসাটা হচ্ছে প্রেমিকের মনে। বাইরের বস্তু-সাক্ষাতে যখন হোম্‌রাই-চোমরাই বনস্পতিগুলো পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তখন প্রেমের বাসাটায় সদ্য-প্রসূত ডিমগুলোয় তা

দেওয়ার কাজ আফিমের নেশায় মত আরামে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর সঙ্গে বোকাই, গোনেকূপ প্রভৃতি ইউরোপীয় লেখকদের মতামতের কোথায় কী যোগ তা রুচিবান্ পাঠকমাত্রেই জানেন।

আপাততঃ সত্যপ্রসাদের প্রস্তাবে হিতেনের মনের নিভৃত অর্কিদ-গাছের পাতাগুলো বসন্তের বাতাসে সির্-সির্ করে কাঁপতে লাগলো, এবং গহন বনভূমির দুর্ভেদ্য পত্রপল্লবের প্রচ্ছদ ভেদ করে তাকে সেদিন প্রথম অভিজ্ঞতার সূর্যতাপ স্পর্শ করলে, যদিচ, স্মরণ রাখতে হবে, তখন হেমন্তকাল চলেছে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই টিপ-টিপিনি বৃষ্টিতে সুদীর্ঘ বাদল-রাত্রির সূচনা করছে।

তিন বন্ধুতে হাল-ফ্যাসানের বেন্-কোটের বিজ্ঞাপনের কায়দায় বর্ষাতিতে কান ঢেকে মার্কিনী ডাকাতের মত মাথার একদিকে তেরচা করে টুপি বসিয়ে লণ্ডনের বৃন্দাবন, মার্বল্ আর্চ-এর মোড়ে দোতলা বাস্ থেকে নামলো।

অমল ছিন্না-ছেঁড়া ধনুকের মত অকস্মাৎ শিথিলভাবে তার কোল-কুঁজো পিঠটাকে খাড়া সোজা করে বললে—হিতেন, কুরাস্ কুরাস্, অমন বিচলিত হলে চলবে না, এতদিন আমরা যে-লাইফ লীড্ করে এসেছি, সেটা শুধু লাইফের পৌষচন্দ্রিকা।—তারপর মার্বল্ আর্চ-এর মর্মর-নির্মিত তোরণের তলা দিয়ে যাবার সময় যোগ করলে—এইবার আমরা সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রবেশ করলাম। কী বলো হে সত্যপ্রসাদ?

সত্যপ্রসাদ একক্ষণ তন্ময় হয়ে শিস্ দিয়ে Under the

Marble Arch-শীর্ষক একখানা রেকর্ডে গানের সুর ভাঁজছিল। অমলের দিকে না তাকিয়েই সত্যকর্তা স্বগতঃ উত্তর দিলে—তোমরা এখনো লণ্ডনের কিছুই চেননি। মার্বল্ আর্চ-এ যে ডিসেণ্ট্ জিনিস পাওয়া যায় না, তা আমরা কেম্ব্রিজে থেকেও জানি। এদিকের এগুলো টৈরিরি ম্যান্-হ্যাণ্ড্লড্। তাদের খপ্পরে একবার পড়লে বেরিয়ে আসা তোমাদের সাধ্য নয়। রেস্পেক্টেব্ল্ পার্স্ন্ কি এদিকে আসে? সার্পেন্টাইন্-এর ওপারে না গেলে তাদের দেখা মিলবে না।

হাইড্ পার্কের বুক-চেরা এই সর্পিল পরিখাটি অতিক্রম করে তারা একটা প্রকাণ্ড লাইম্-গাছের তলায় বেঞ্চের ওপর এসে বসলো। হিরেন, সত্যপ্রসাদ আর অমল। কুয়াশার সঙ্গে মেশা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা তাদের টুপি আর রেন্-কোটের ওপর নানান্ রকমের এলোমেলো নক্সা কাটতে লাগলো। তিন বন্ধু পাইপে অগ্নি সংযোগ করে, ধারে-কাছের পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে, আজকের এই হেমন্তের বাদল-সন্ধ্যায় পরিণতি সম্বন্ধে আপন-আপন চিন্তিত কল্পনাকে নিজেদের আড়ে আড়ে হারিয়ে ফেললে।

হিরেন ভাবছে, আজ যার সঙ্গে দেখা হবে, সেই-কি তার জীবনের প্রথম ভালোবাসী নারী? কৈশোরে যে মানসী কবিতায় প্রেরণার আবরণ ভেদ করে ক্ষণে ক্ষণে তার নব-উদ্বুদ্ধ

চেতনাকে স্পর্শ করতো, প্রথম যৌবনে যে তার চোখের সম্মুখে একদিন জীবনের এক অপূর্ব বিস্ময়-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিল, সেই মানস-সুন্দরীর সঙ্গে আজিকার এই হেমন্ত সন্ধ্যার অপেক্ষিতার সাদৃশ্য কোথায়? তার মনে পড়লো, বহুদিন আগে বাংলা মাসিকের পাতায় একটি বিজ্ঞাপনের ছবির মুখ। তাকে ঠিক ছবি বলা যায় না, শুধু কয়েকটা রেখার টান। কিন্তু তাতেই যে ঢলঢলে মুখখানিতে যৌবনের পরিপূর্তি ও প্রতি অঙ্গের নারী-সুলভ নিষ্ক্রিয় লিপ্সা ফুটে উঠেছিল, সেও তো নমিতা ছিল না, ছিল তার কামনা-বাসনার অনূঢ়া বারাঙ্গনা। আজ যে আসবে সে যদি তার রক্ত-মাংসের অস্তিত্বকে অবলীলায় বিজ্ঞাপনের ছবির মতই তার ভোগ-লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাতে তার গ্লানি বোধ হবার কোনো কারণ নেই। হিতেনের মন এবার সত্যিই তার আজন্ম সংস্কার, সংশয় ও সন্দিহার বন্ধন ছিন্ন করলে। যে আসবে তাকে নিতান্ত সহজ ও সরলভাবে গ্রহণ করবার জন্যে সে মনে মনে প্রস্তুত হলো। সে বসে বসে ভাবতে লাগলো, ঐ সে এলো বুঝি; অন্ধকারের অতল তল থেকে পায়ে চলার শব্দে নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করে তার সামনে এসে দাঁড়ায় বিদেশিনী নাগরী। চপল চোখের ইশারায় বলে, Will we go? হিতেন স্বপ্নাবিষ্টের মত তার অনুসরণ করে। খানিকদূর গিয়ে সে হিতেনের দ্বিধাজড় হাত-খানাকে আপন হাতে টেনে নেয়, তার পাঁচ আঙুলের সঙ্গে আপন পাঁচটা আঙুল বুনে জিজ্ঞেস করে—Why are you so

shy ? তারপর নিজেই প্রস্তাব করে—Let's go to Soho, will we ? হিডেন তার সঙ্গে হাতে হাত রেখে হাইড্‌ পার্কের বড় বড়-নিষ্পত্র গাছগুলোর তলায় আলো-অন্ধকার পথ দিয়ে চলে। সহসা হিডেনের গলায় তার হাতদুখানা জড়িয়ে দিয়ে সে ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে শুধায়—You aren't sorry, are you, sweet ? তারপর তারা বাসে চড়ে সোহোয় এসে ঠিক সেই ইতালীয় রেস্তোরাঁতে ঢোকে যেখানে হিডেন প্রায়ই এসে বসে দান্তে, পেত্রার্কা, দেলেদ্দা বা পিরানদেল্লোকে সঙ্গে নিয়ে; হিডেন ক্রমে আপন অভ্যস্ত আবহের মধ্যে এসে পড়ে। পরিচারককে সংক্ষেপে হুকুম করে—Uno mezzo bianco ; আজ যেরকম ভিজে স্যাঁৎসেঁতে দিন করেছে, তাতে লালের চেয়ে শাদাটাই ভালো—It's a little dry, at any rate, শেষ মন্তব্যে হিডেনের সহচারিণী আপন মত ব্যক্ত করে। সবিস্ময়ে হিডেন আবিষ্কার করে, সে ফরাসী ও ইতালীয় অনর্গল বলতে পারে, সাহিত্যেও তার অধিকার কম নয়। বেআত্রিচের রূপ বর্ণনা-বিষয়ে দান্তের কথা আবৃত্তি করে হিডেন বললে—

Ciascuna stella negli occhi mi piove

সে পাদপূরণ করে দিলে—

Della sua luce, della sua virtute.

সুন্দর তার উচ্চারণ, কথাগুলো আবৃত্তি করবার সময় তার লাবলীল জিভখানি মুক্তোর মত দাঁতগুলোকে লঘু ও ক্ষিপ্র গতিতে স্পর্শ করে গেল,

যেন "নাক্র্"-খচিত নীল-মখমলের ওপর নিপুণ আঙুলের চঞ্চল ঝংকার। তারপর চলে সাহিত্য আলোচনা। পেত্রার্কার কাব্যের বীজ কীভাবে রঁসারে বিকাশ লাভ করে, পরবর্তী ফরাসী কাব্য-সাহিত্যকে ফলে-ফুলে ভরে তুললে, এ-আলোচনাতেও সে হিভেনের সঙ্গে অতি সহজভাবে যোগদান করলে। তারপর যখন রেস্তোরাঁ বন্ধ করবার সময় হলো, তখন তারা পথে বেরিয়ে চললো ব্লুমসবেরীর দিকে। ঝুরঝুর করে বৃষ্টি নেমেছে! হালকা কুয়াশা ঢাকা লণ্ডন শহরটাকে বাস্তব বলে মনে হয় না। হিভেনের রেন-কোটটা দুজনে ভাগাভাগি করে মুড়ী দিয়ে তারা চলেছে। হিভেন পোল্ ভের্লেন্ আবৃত্তি করে—

Il pleure dans mon coeur

সে পূরণ করে দেয়—

Comme il pleut sur la ville.

হিভেন ভাবে,

যাকে সে আপন বাসনার সহচরীরূপে পেতে চায়, সে যে নর্তকীর মত রাত্রে কবিতা ও প্রভাতে নন্দিতার মূর্তি ধারণ করবে, এর চেয়ে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা জগতে নেই। তার সঙ্গে যদি শরীর ও মনের আদানপ্রদানী না পাওয়া গেল, তো সে কামনার তাৎপর্য ঘটনা-চক্রে বংশরক্ষার মতই দুর্নৈতিক। ব্লুমসবেরীর গরীব পাড়ার রাস্তার দিকের তার বোহেমীয় ধরনের ঘরখানায় এসে তারা ঢুকলো। সে-বাড়ীতে ইলেকট্রিক নেই। গ্যাসের আলোটা জ্বালতে আর প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে আগুন জেলে সে তার সঙ্গিনীর গা থেকে

ভিজে জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে আগুনের ধারে ছোট্ট কাঠের পর্দাটার ওপর মেলে দেয়। তারপর তারা দুজনে মুখোমুখি আগুনের কাছে বসে। হিতেন প্রস্তাব করে—

Shall we brew some tea ?

What a topping idea ? Do let's, will we ?

গ্যাস্-রিঙের ওপর কেৎলীটা চড়াতে চড়াতে হিতেন দেখে, সে তন্ময় হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে আছে, তার মুখের ওপর পড়েছে আগুনের লাল আভা, কপালের ওপর ঝুমকো ঝুমকো সোণার বরণ চুল। হিতেনের মনে পড়ে ছেলেবেলাকার Cinderella, যার কাহিনী সেই অল্প বয়েসেই তার বুকে একদিন কামনার আগুন জ্বালাতো। হিতেনের মন সেই বাদল-রাত্রির কাম-ক্রীড়ার প্রতিটি উপকরণ, প্রতিটি ঘটনা কল্পনার পটভূমিতে আস্তে আস্তে এঁকে চলে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে সত্যপ্রসাদ ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে, সওয়া সাতটা। এদিককার কাজকর্ম সেরে নটার শো'টায় যাওয়া হয়ে উঠবে কি না, সেই চিন্তাটাই বারে বারে তার মনকে হাতীর ওপর আঙ্কুশ ঘসার মত করে পীড়া দিচ্ছে। আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখবার জন্যে সে মুহুর্মুহু পাইপে অগ্নিসংযোগ করে মনে মনে হিসেব করছে—Five bob for this, a shilling for the other thing, half-a-

crown for the show, that makes eight and six in all. I'll have only one and six left. Well, to-morrow's Sunday, you get your dinner and supper from the landlady-Then on Monday to Cook's. Papa sends his cheque for thirty quid, and that finds me a quid pro quo for this muck of a life in London. নিজের বাক্য-বিন্যাসের চাতুর্যে সে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উত্তেজিত দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তার হাসি পায়, মনে মনে বলে—Nanny's darlings. Why the hell, can't they grow up ? Sentimental idiots, they've yet to learn quite a deal from life. Amor non est, my sweeties, amor non est.

অমলের চিন্তাস্রোতও হিতেনের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল রেখায় বয়ে চলে। তার সমুখে যে-মেয়েটি এসে দাঁড়ায়, তার অদ্ভুত রূপ আর অদ্ভুত বাক্য। এক কথায় যাকে বলা যায়, তার ভাষায়, ইন্দ্রিয়বিভ্রম-মর্দিনী। এক দিকে যেমন সে বত্তিচেল্লী, মানেলো, বা কৌতির চিত্র-নায়িকা-সমূহের প্রতিরূপ লাভ করে, অপর দিকে সে মার্কিনী Musical Comedy-র কোরাস্‌ গার্ল্‌স্‌-এর মত চপলা, প্যারীর Folies bergéres-এর নর্তকীদের মত চটুলা, এবং চিত্রকর ইন্‌স্টাইন্‌ পরিকল্পিত জবেল্‌-মুখর-কাঁথা জার্মান কল্পনীদের মত নিটোলা। তার পুরুষ-সাজে চোখ, তার উত্তপ্ত

হাতের কনুইএ চৌল। অমলের নিজের চেহারা রোগা-ছিপছিপে হলেও এবং তার নিজের মগজও মাংসবিরল হলেও, এই যে পরিপুষ্ট ললনাটির রূপ বর্ণনা করা গেল, এ তার মানসী-মূর্তির ছবি। তার নিকট বন্ধু ও পরিচিতেরা সবাই জানেন, চিত্রকর গোগ্যাঁর মত একটু জংলী মেয়েদের প্রতিই তার আসক্তি বেশী। সুতরাং সলিল সার্পেন্টাইনের তীরে যখন আর উঁকি-ঝুঁকি মুক্তির মায়াজালের ভেতর রেন্‌-কোট মুড়ি দিয়ে বসে সে তার ইন্‌হিবিশন্‌-নিবারণের জন্যে যে নিবিড়তার মূর্তি মনে মনে আঁকতে বসলো, তার সঙ্গে যে ওপরের বিবরণের হুবহু মিল আছে, একথা অমলের বন্ধু বা পরিচিত যাকেই স্বীকার করবেন। অমলের সামনে এসে দাঁড়াতেই, সে খুব একটা ফরোয়ার্ড্‌ অ্যাটিটিউড নিয়ে নিজেই প্রস্তাব করলে—Shall we go ? উত্তর যেমন আশা উচিৎ তেমনিই এলো—Yes, will we ? তবে তার কথা বলার এমন একটা চঞ্চল, চপল, চটুল ভঙ্গী আছে, যা তার কণ্ঠের স্ফুলিঙ্গকে কণে কণে মুক্তি দেয়, এবং যা উল্কার মত অমলের বুকে এসে লাগলো, যে সে হাইড্‌পার্কে বা “অ্যাস্টোরিয়া-”তে বৃথা কাল-বিলম্ব না করে মাটির নীচে বিদ্যুৎ-যানে চড়ে আপন নিবিড়াকে বগলদাবা করে উল্কার মতই ছুটলো ক্ল্যাপহ্যাম্‌ সাউথে আপনার কমন্‌-রুমে। ওর বাড়ীর রাস্তায় এসে তার উল্কা-গতি শামুকের গতিতে পরিণত হলো, কারণ তার নিজের মন খুব ফরোয়ার্ড্‌ হলেও তার ল্যাণ্ড্‌লেডীর মন সংস্কারের জমাট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং এই বর্ষীয়সী মহিলার

মনে যীশুপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনো ঐহিক প্রেম বা অনুভূতি
যে কখনো প্রবেশ-লাভের সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি, তা তার
আকারের পরিধি ও ব্যাস এবং নাকের ওপর ষ্ট্রবেরীর মত
একটা আবের অস্তিত্ব থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।
সুতরাং সে-ব্যক্তি সারা জীবন ভগবদ্ভক্ত-বাসরে অতিবাহিত করে
এসেছে, এবং যার বাড়ীর প্রতি ঘরে ভাড়াটেদের নিদ্রার
উদ্রেকের জন্যে বিছানার পাশের টেবিলের ওপর একখানি করে
বাইবেল রাখা আছে, সে যে হাসিমুখে অমলের এই স্পর্ধা
বাসরে অনুমতি দেবে, এরকম আশা করা দুরাশা মাত্র।
কলিযুগের এই মারীয়া মাগ্‌দলনাকে অমল মনে মনে উপভোগ
করলেও তাকে সে সম্ভ্রমমত ভয় করে চলতো, কারণ পাঁচ
মিনিটের নোটিস্ দিয়ে ভাড়াটের ক্যাবিন-ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস্,
টুপি, ছাতা, ছড়ি প্রভৃতি ফুট-পাথের ওপর হাজির করেছে,
এ-দৃশ্য অমল স্বচক্ষে দেখেছে। এবং এই বৃদ্ধার বাড়ী থেকে
নিষ্ক্রান্ত হলে অমলের একদণ্ড চলবে না। ঘড়ি ধরে যথেচ্ছ-
পরিমাণে আহার্য এবং ঘুমতে যাবার আগে স্যানাটোজেন বা
হর্লিক্সের সঙ্গে আপেল, নেসপাতি, এবং প্রতিবার ভোজনান্তে
কস্‌কারিনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এত সুখ-সুবিধা লণ্ডনের
কোনো ল্যাণ্ড্‌লেডীর বাড়ীতে পাওয়া যাবে কিনা, সেটাও ভেবে
দেখবার বিষয়। তাছাড়া সাপারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে
যে বৃদ্ধার ইংরেজ-পরিচিতাদের সামনে বেদ-উপনিষদের মাহাত্ম্য
ও ব্রহ্মচর্যের তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে চরিত্রবান্

ব্যক্তি বলে যে রেপুটেশন্ অর্জন করেছে, তার অবস্থাটা কী হবে, সেটাও বিশেষ চিন্তিতব্য। কারণ তার ব্রহ্মচর্য-গুণ-মুগ্ধ অবিবাহিতা বৃদ্ধাদের কাছে তার সপ্তাহে দুটো-তিনটে চা বা সাপারের নিমন্ত্রণ একেবারে ধরা-বাঁধা। এবং একথা অমল উত্তমরূপেই জানতো যে, এই অবিবাহিতা মাগ্‌দলনাপুঞ্জ খ্রীষ্টমাতার অলৌকিকের গর্ভধারণ ও খ্রীষ্টের ব্রহ্মচর্যে এমন অটল এবং কঠোর বিশ্বাস পোষণ করেন, যে তাঁরা উক্ত আদর্শের তিলমাত্র উল্লঙ্ঘন মহাপাতক জ্ঞান করে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক এক নিমেষে বন্ধ করে দেবেন। এতে অমলের ক্ষতি এইদিক দিয়ে যে, সে যে ইংরেজ সমাজে অবাধে বিচরণ করে, একথা আর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উল্লেখ করতে পারবে না। অমলের মন যখন তার কল্পিত নিষিদ্ধাকে নিয়ে বিব্রতভাবে আপন ঘরে প্রবেশ-লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ীর আনাচে-কানাচে বৃথাই ঘুরে মরছে, ঠিক সেই সময়ে দূরে ভিজে রাস্তা মাড়িয়ে চলা পায়ের শব্দ তিন বন্ধুকে সজাগ করে তুললে।

সত্যপ্রসাদ মুখ থেকে পাইপ না নামিয়েই বললে—হ্যা ভোয়াগ্যা!

অমল সোজা হয়ে উঠে বসে বললে—পুলিসম্যান্ নয়তো?

সত্যপ্রসাদ অমলের অর্বাচীনত্বে হেসে উঠলো—তুমি সাইকলজি পড়তো না হাঁদা! না জানো তো শিখে রাখো,

পুরুষের পায়ের চলন কথা ঠাসা-ঠাসা, আর মেয়েদের ছোট ছোট আর তাড়াতাড়ি !

অমল একটু অপ্রতিভ হয়ে উত্তর করলে—Oh yes, yes, such a simple thing, এসব আমরা ছেলেবেলায় Boy's Scout-এ থাকবার সময়েই শিখেছি, বুঝলে ছিলেন, মানে এই সাইকোলজিস্ট কম করা হয়নি ! এসব গোয়েন্দা পুলিশ-মার্কা ছেলে !

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে শুনে সত্যপ্রসাদ অমলকে ইশারায় থামতে বললে, এবং পরে শব্দ লক্ষ্য করে ডাকলে—কু-হু ! হ্যালো, কু-হু !

উত্তর আসতে দেরী হলো না—কু-হু !

অমল উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালো, যেন সত্যপ্রসাদ এক্ষিমের শিকার পাকড়ে তারই হাতে তৎক্ষণাৎ অর্পণ করবে। সত্যপ্রসাদ একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ডাকলে—কু-হু, হ্যালো, Where are you ?

উত্তর এলো—Allo, heer, kan you heer me ? Haff you found hairr ?

সত্যপ্রসাদ—Whom ?

কণ্ঠস্বর—My toghter. A leettle child of taehn. I lost hairr about an hour ago, in ziss park.

সত্যপ্রসাদ দুই বন্ধুর দিকে চোখ টিপে বললে—Oh yes. Well, come nearer, here under this tree.

হিতেন বললে—বিদেশী, বেচারীর মেয়ে হারিয়েছে।

সত্যপ্রসাদ হিতেনের অনুমান হেসে উড়িয়ে দিলে—ন্যাঃ! তুমিও যেমন হিতেন্দ্রনাথ, don't be so naif, এরকম একটা ছুতো না করলে পুলিশে এক্ষুনি টুঁটিটি টিপে ধরবে, সেদিকে খেয়াল আছে?

অমল সহাস্য প্রতিধ্বনি করলে—Galsworthy-র Escape-টাও পড়োনি হিতেন?

বন্ধুদের কথোপকথন লক্ষ্য করে দু-এক মিনিটের মধ্যেই তাদের সামনে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত এসে দাঁড়ালো হেমন্ত-সন্ধ্যার অপেক্ষিতা। সত্যপ্রসাদ ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ করবার জন্যে একটু এগিয়ে গেল, বললে—Good evening. How are you? A bit chilly, isn't it?

Okh yes, eet ees kalt, b-r-r-r-r-r, ferry kalt! Haff you sin my toghter, a leettle garl of tsehn yar? Ikh habe, I haff lost hairr in ziss park. Und jetzt, and now I kann nicht find hairr.

Is that so? Well, I'm sorry to hear that, very sorry indeed! Now, how about a walk?

A wak, yees, if you sink, ve kann find hairr.

হিতেন উঠে এসে জার্মান ভাষায় সমাগতাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলে, ঘণ্টাখানেক আগে সে তার দশ বছরের মেয়েটিকে হাইড্‌ পার্কে হারিয়েছে, এবং একঘণ্টা ধরে সে তার মেয়ের খোঁজে সমস্ত পার্কটাকে চষে ফেলেছে! তবু বাকী

জার্মানীতে, ফ্রাঙ্কফুর্টে, অল্পদিন হলো সে ইংলণ্ডে এসেছে, লণ্ডনের পথ-ঘাট তার কিছুই জানা নেই। হিতেন নিজেই তাকে মেয়ের খোঁজে থানায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে।

Okh, sank you ferry, ferry moch, shall ve go?

Oh yes, do let's, will we?—হিতেন বেশ একটু আড়ম্বর করে উত্তর দিলে। এবং নব-পরিচিতার সঙ্গে সে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

অমল অধীরভাবে সত্যপ্রসাদকে বললে—তুমি যাই বলো ভাই, ও আজ আমাদেরও হার মানালে। দেখেই বোঝা যায়, এসব কাজে ওর পাকা হাত, শুধু মুখে ভণ্ডামী করে।

পাকা হাত না, my eye! ওর মত অভদ্র আমি দুনিয়ায় দেখিনি! জানিস্ না হয় বাপু দু'চারটে ভাষা, তা অমন demonstrate করবার কী দরকার! আমরা যে-ভাষা বুঝি না, সে-ভাষায় কথা কয়ে বাহাদুরী দেখানো হলো! কিন্তু বাছাধন বোঝেন না, এদিককার মেয়েরা ও তোমার ফ্রেঞ্চ, জার্মান কলের জলের মত ঝর্-ঝর্ করে ঝাড়তে পারে। ওর মুখ দেখা উচিৎ নয়। নেহাৎ পুরোনো বন্ধু তাই, তা না হলে—

বেচারীকে সাবধান করে দেওয়া উচিৎ।

দিতে হয়, তুমি যাও, আমি ন'টার শো'তে চললুম।—সত্যপ্রসাদ কানের ওপর রেন্-কোটের কলার তুলে দিয়ে শিস্ দিতে Under the Marble Arch-এর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মার্বেল্‌টাইন্ পার হয়ে গেল।

হিথেন তার সঙ্গিনীকে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় এসে পৌঁছল। এই প্রথম তার অপেক্ষিতার মূর্তি তার নজরে পড়লো। প্রকাণ্ড তার চেহারা, বয়েস পঞ্চাশের নীচে নয়, থুৎনীর নীচে দাড়ী, নাকের নীচে গোঁফ, হৃষ্টপুষ্ট জার্মানী ইহুদিনী। তার জীবনের এই প্রথম অভিসার যে আজকের এই হেমন্ত-সন্ধ্যায় এমন নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত হবে, এ কথা উপলব্ধি করে তার ভাগ্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে নিজেই মনে মনে খুব খানিকটা হাসলে। ঠিক এই সময়ে সে পেছন থেকে শুনতে পেলে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় অমলের গলার স্বর :

হিথেন, বন্ধু হিসেবে তোমায় সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যে, এদিককার মেয়েরা জুনো, একেবারে স্ফিংস। বিদেশী ভাষা বলবার মোহে নিজেকে ভুলো না তাই। খুব সাবধান। সিগারেট দিলে নিও না। শুনচো? তাড়াতাড়ি ফিরো, শুনচো?

হিথেন ল্যাম্প-পোস্টের কড়া আলোয় আর একবার তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হলো। অমলের কথার জবাবে শুধু একটা "হ্যাঁ, ধন্যবাদ" বলবারও তার প্রবৃত্তি হলো না।

কলিকাতা,
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

পুতুল-নাচ

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাংলাদেশে যেমন আকুল করে বর্ষা নামে, সে-বছর তেমনি জুলাইয়ের মাঝামাঝি অসহ্য গরমের পর হঠাৎ এসেছে, অকালে আকাশ-ভাঙা বাদল শুরু হলো। অমরেশ রায়ের পয়সার অভাব ছিল না, নেপালের তরাইয়ে তাদের প্রকাণ্ড জমিদারী, এবং একমাত্র সে নিজে ছাড়া তাদের বিশাল জায়গীরের ভোগ-দখল করবার মত আর কেউ ছিল না। সুতরাং কলকাতার বাড়ী তুলে দিয়ে সে এসেছে ছোট একখানি বাংলো কিনে ইংলণ্ডেই বসবাস ও শিল্প-চর্চা করে। এলিং-ফরেস্টের কাছে ঢালু জমীর ওপর বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটি। শহরের ক্ষিপ্র জীবন ও তরাইয়ের নির্জনতা, দুই-ই একেবারে হাতের নাগালে পাওয়া যায়।

লন্ডনের চেল্‌সী-ব্লুমস্‌বেরী এবং পারীর বুলভার্‌ দেখি-তানিয়াঁর রেস্তোরাঁ-বাসী আঁকিয়ে, বাজিয়ে ও লিখিয়েদের সঙ্গে আত্মীয়তা রাখবার পক্ষেও এ জায়গাটায় সব দিক দিয়ে সুবিধা। কারণ অমরেশের বাংলো-বাটিকায় উইক্‌-এণ্ড্‌ করে যান্‌নি, এমন চিত্র, সুর বা কথা-শিল্পী ইংলণ্ড ও ফ্রাঁসদেশে খুব অল্পই আছে। তা যদি আপনারা শপথ করতে চান্‌ তো বেশী দূর যেতে হবে না, অমরেশের ভিজিটার্স্‌ অ্যাল্‌বাম্‌ দেখলেই বুঝতে পারবেন। অমরেশ রায় লোকটা কে, এবং সে যে শুধু লিঙ্কন্‌স্‌ ইনে নাম-লেখানো সাধারণ ভারতীয় আইনের ছাত্র নয়, এই কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই উপরের অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হলো। এখন, সে-বছর এসেক্স-এর বর্ষার সঙ্গে অমরেশের কী সম্পর্ক, সেইটেই এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য।

এক নাগাড়ে এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি পড়া এমন কি ইংলণ্ডেও গরমকালে আকছার ঘটে না। এবং দ্বিতীয় দিনেই অমরেশের সর্দি হয়ে একটু গা গরম হলো। ঝিকে অ্যাস্‌পিরিন্‌ ও গরম লেবুর জল দিতে বলে, সেই যে সন্ধ্যার দিকে সে শয্যা নিলে, তারপর পাঁচ দিন সে বিছানাতেই প্রাতরাশ, মাধ্যাহ্নিক ও সান্ধ্য ভোজন গ্রহণ করলে। অমরেশ যে শয্যাশায়ী অবস্থায় পাঁচ দিন কাটিয়ে দিলে, তার কারণ এই নয় যে, তার অঙ্গের উত্তাপ একবার মাত্র ৯৯-এ পৌঁছেছিল। তার কারণ তার পঁচিশ বছরের অক্লান্ত জীবন সহসা ঝিমে এসে ঠেকলো। এবং এইখানেই ছিল বর্ষার কারসাজি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে হু-হু করে, এবং টেবিলের ওপর দিন-পত্রিকাটা সারা সপ্তাহের এন্‌গেজমেন্ট-হীনতায় হাহাকার করছে, এই অবস্থায় শিল্পপ্রাণ ব্যক্তি কী করতেন জানি না। অমরেশ ম্যান্ট্‌ল্‌-পিসের ওপরে এক সারি বইএর মধ্যে থেকে একখানা টেনে নিয়ে আগুনের ধারে আরাম করে বসলো। বইখানার নাম "সাফো", লেখক আল্‌ফঁস্ দোদে। সেনের ধারে বুকিনিস্ত্‌-দের দোকান থেকে লেখানিকে পাতা-না-কাটা অবস্থায় সে পুরানো দরে কিনেছিল আজ পাঁচ বছর আগে, যখন সে ঐ লেখকেরই লেখা অন্য গ্রন্থকে টার্টারিন্ বলে না, বলে "তার্তারাঁ"। প্রথম পাতা কাটতেই চোখে পড়লো উৎসর্গ—A mon fils quand il aura vingt ans—আমার ছেলেকে, যখন সে কুড়ি বছরে পড়বে। তার পরের পাতা থেকে গল্পের সুরু—

দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ! দক্ষিণে বাড়ী বুঝি? পারীর একটি বোহেমীয় জলসায় অভ্যাগত দক্ষিণ-দেশী একটি কাঁচা বয়সের লাজুক ছেলেকে শুধায় একটি সুন্দরী যুবতী। বাংলা ভাষায় "সাফো"র অনুবাদ বেরিয়েছে, সুতরাং সে-বইয়ের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা করে দিয়ে সময় নষ্ট করবো না। এমন অদ্ভু ও প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপন্যাস আজ পর্যন্ত কেউ আরম্ভ করতে পারে নি। কথাকটির অদ্ভু প্রতিক্রিয়া অমরেশকে আবিষ্ট করে রেখে দেয়। এবং সে ল্যারুসের অভিধানের সাহায্যে নতুন করে বইখানির রসাস্বাদনে রত হলো। ভালো করে ফরাসী ভাষা জানলে হয়তো সে একদিন বা দুদিনেই বইখানি শেষ করে

ফেলতো, এবং শেষ করে বলতো, বা বেশ বই! কিন্তু সে যে কথার পর কথার মানে দেখে চললো, এতে শব্দার্থের ব্যঞ্জনা তার মনকে অস্থির করে আস্তে আস্তে দেহের চেতনাকে আঘাত করতে লাগলো। এবং ক্রমে বারে-বারে সে নিজেকে গল্পের নায়কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে লাগলো। ফলে নায়িকার আদর ও চুম্বন ইত্যাদি বাইরের অনর্গল বর্ষণের মত তার নিজের ওপরেই অবাধে বর্ষিত হলো। উত্তেজনায় তার মাথায় জ্বরো ভাব দেখা দিলে, এবং ঐ-অবস্থাতেই সে তার সমগ্র চৈতন্য ও চেতনা দিয়ে বইখানিকে পড়ে শেষ করলে।

যেদিন বৃষ্টি ধরণ করলে, তার আগের দিন রাত একটায় বইখানা শেষ হলো। সমাপ্তির দিকে বইখানার যে বিষাদ তা এক অদ্ভুত উপায়ে অমরেশের মনে তার নিবিড় দৈহিক প্রতিক্রিয়াকে নিবিড়তর করে তুললে। আপন নাগরীর সঙ্গে ইন্দোচীনে যাবার জন্যে ছেলেটি মার্সাই-এ অপেক্ষা করছে, এমন সময়ে প্রেমিকার চিঠি এলো, সে যেতে পারবে না। তাদের বয়েস ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য কম নয়, তাছাড়া সে পূর্ববর্তী প্রেমিকের সঙ্গে ঘরসংসার পেতে বসেছে। এ-ধরণের উপসংহারে অমরেশ একটু বিষাদ অনুভব করলে বটে, কিন্তু নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচয় ও সম্পর্কের চিত্রগুলি এতে আরো সজীব হয়ে উঠলো। তার কেবলই মনে পড়তে লাগলো দুটি-দৃশ্য: প্রথম, যখন নায়িকা নায়ককে প্রেমের ফাঁদে ফেলবার জন্যে বলছে— দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ!—তার কয়েক পাতা পরে নায়ক

দক্ষিণ-দেশী শাড়ীতে নবাগত ছাত্র, নায়িকাকে নিজের ঘরে নিয়ে চললো। আপন দয়িতাকে পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে যখন সে তার বহু ওপরতলায় নিজের ঘরের কাছে নামিয়ে দিলে তখন নায়ক-নায়িকার বাক্যবিনিময়—

Enfin! যাক্!

Déjà?—এর মধ্যেই?

অত অল্প কথায় একটা সম্পূর্ণ নাটক আজ পর্যন্ত কেউ লেখেনি। অমরেশের কেবলই মনে পড়তে লাগলো—দেখি, দেখি কী সুন্দর চোখ!—এর মধ্যেই? এই দুটি দৃশ্যের আবহ সেদিনকার বৃষ্টি-ভেজা, মেঘ-থমথমে সকাল-বেলাটার সঙ্গে যোগ দিয়ে অমরেশের বয়সের অঙ্ক থেকে স্রেফ পনেরোটা বছর বেমালুম সরিয়ে ফেললে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে সে দেখতে পেলে, এশিং কলেজের উইলিয়াম্ দি কঙ্কারারের আমলের বড়-বড় শাহুকলো পর্বতশ্রেণীর ভ্রম ঘটাচ্ছে। তার ওপরে আকাশ-জোড়া প্রকাণ্ড একখানা কালো বর্ষণোন্মুখ মেঘ। ছেলেবেলায় পণ্ডিত মহাশয়ের হাজার ব্যাখ্যাতে সেও যা বুঝতে পারেনি, আজ তা উপলব্ধি করা কত সহজ! মেঘালোকে ভবতি সুখিনো ঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ। তাই বলছি আজ অমরেশের চেতবৃত্তির এই যে বিকার ঘটলো তাতে ইংলণ্ডে অভাবনীয় বসন্তের মত এই বর্ষার কিছু কারসাজি ছিল নিঃসন্দেহ।

অমরেশ জানলা দিয়ে বাড়ীর বাগানটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, সেটা একটা ভিজে বুটিদার গালচের মত সপ্-সপ্ করছে।

দৃষ্টি-পরিধিকে সঙ্কুচিত ক'রে তার দিকে তাকালে সেটাকে সত্যিই একখানা গালচে বলে ভুল করা চলতে পারে। অমরেশের মনে পড়লো, কয়েকদিন আগে বিকেলের দিকে, কিটির সঙ্গে চা খাবার সময়ে, তার হ্রদের কেয়ারী-দেওয়া লনটির ঐ একটি উপমাই সে শুনেছিল—What a wonderful lawn, just like a rich Persian carpet, isn't it ? এই সূত্রে মনে পড়ে কিটির কথা, তার যৌবন-ভরা প্রতিটি অঙ্গ, তার প্রসাধিত কালো চুল, ইস্পানী ঢঙের খোঁপা, তার ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখী আঁখি-পল্লব, তার "নাক্‌"-এর মত ঝকঝকে দাঁত, তার সত্যিকার পক্ব বিম্বাধরোষ্ঠ। এই কিটি যদি তাকে গল্পের নায়িকার মত বলে—দেখি, দেখি, কী সুন্দর চোখ !—কথাটা মনে হওয়ায় তার প্রথমে হাসি পেল। কিন্তু সুন্দর চোখের কথা না তুলে ঐ ধরণেরই কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন করা কি তার পক্ষে অসম্ভব! মেয়েদের কাছ থেকে কোনো একটা সক্রিয় প্রস্তাবের উন্মাদনা যে কতখানি নিবিড় ও শক্তিশালী হতে পারে, অমরেশ তা সেদিনে তার চেতনায় অণু-পরমাণু দিয়ে অনুভব করতে লাগলো, এবং বারে-বারে তার মনে পড়তে লাগলো—এর মধ্যেই, déjà ? এই বাদল-প্রভাতে কারো সক্রিয় বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে তার দেহ-মন উৎসুক হয়ে উঠলো। কেবলই তার মনে হতে লাগলো, কিটির মত কে যেন তার বুকের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছে—Come to my flat, come to supper, will you ? অমরেশ এর পরের প্রতিটি ঘটনা নিখুঁত,

জীবন্ত ও বাস্তবভাবে কল্পনা করবার জন্যে পাশ ফিরে শুলো। ঠিক এই সময়ে টক্‌টক্‌ করে দরজায় আঙুল দিয়ে শব্দ করে ট্রেতে ব্রেক্‌ফাষ্ট্ সাজিয়ে ঝি আন্‌না এসে ঘরে ঢুকলো।

Good morning, Sir.

Good morning, Anna!—অমরেশ প্রত্যেকটি কথার ওপর অসাধারণ জোর দিলে। প্রভুর কথার অদৈনন্দিন আন্তরিকতার রেশটুকু আন্‌নার কান এড়ায় না, কারণ বক্তার অভিপ্রায় তা ছিল না। আন্‌না দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচকে হেসে ছোট টেবিলটার ওপর পরিপাটি করে ব্রেকফাষ্ট্ সাজিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—Shall I make zome toast, Mr. Ray?—উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অদ্ভুত মেয়ে এই আন্‌না! আল্‌সাসে তার বাড়ী, বাপ জার্মান, মা ফরাসী। সাধারণতঃ সে যেমন নির্লিপ্ত, সংযত ও আবদ্ধ, সামান্য উত্তেজনাকে সে তেমনি সহজভাবে আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত চপলতায় নির্লজ্জ গোলাপের মত বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন Sir থেকে Mr. Ray-এ সম্বোধন যত ক্ষিপ্র গতিতে হয়ে থাকে, পাছে Mr. Ray থেকে Amaresh-এ সম্বোধন তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে বেচারী অমরেশকে প্রায়ই সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। কিন্তু আজ এই সকালেরই একটা অদৈনন্দিন, অভূতপূর্ব আবেগের জন্যে তার মন উৎকর্ণ হয়ে রইল। শ্রেণী-সমস্যা, আত্মসম্মান, প্রতিবেশী-সীমান্ত

বন্ধু-পরিচিতদের শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রভৃতি যেসব কারীগরি স্তম্ভসমূহ তার সত্তাকে Mr. Amaresh Roy of Epping-রূপে খাড়া করে রেখেছিল, সেগুলো চোখের নিমেষে হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আল্‌সাসী চাষার মেয়ে আন্নার উর্বর যৌবনের কাছে বাঙালী, বনেদী ঘরের নীল রক্ত পানসে মনে হলো। চেলসী, ব্লুমস্‌বেরীর শিল্প-সখীদের মিইয়ে-রাখা কাম-বিলাস হাস্যকর বোধ হলো, আর ঐ বুলভার দেজিতালিয়ঁর রেস্তোরাঁ-বাসিনী উচ্ছাসের মেডেমুয়া আজ অমরেশের বিবমিষার উদ্রেক করছে।

অমরেশ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো আন্নার কথা। বেচারী আন্না, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কাজে ফুরসৎ নেই। সদর দরজার ঘণ্টার বোতাম ও নকার্ থেকে শুরু করে অমরেশের হ্যাট্-বাক্সের অব্যবহৃত টুপিগুলো পর্যন্ত মেজে-মুছে ঘেষে-ঘসে প্রতিদিন সাফ্ না করলে তার শান্তি নেই। আলু ছাড়াতে গিয়ে সে প্রায় রোজই একটা না একটা আঙুল কাটে। কাটা আঙুলটা ছোট্ট মেয়ের মত মুখে পুরে চুষতে চুষতে হাজির হয় অমরেশের কাছে—A leetle eeodin plis, if you don't mind, Sir. পোড়-খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের প্যানগুলো Vim দিয়ে ঘেষে ঘেষে তার আঙুলগুলো তার সুপরিমিত, ছট্‌ক মেয়ের আয়তনকে ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকমে মোটা হয়ে উঠেছে। পিয়ানোফোর্টের ওপর ঐ আঙুলগুলোকে কল্পনা করলেও গা শির্-শির্ করে। কিন্তু তার শাদা ধবধবে এপ্রন ভেদ করে

যে আহ্বান হাতছানি দেয় তাকে প্রতিরোধ করা শিবেরও অসাধ্য। আর আজ যখন এই মোহাবিষ্ট মাদুর ভ্রম-ঘটানো কালো মেঘের তলায় এপিং ফরেস্টের দৃশ্য জানলায় ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় অমরেশের চোখের সামনে ঝুলছে, তখন কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ীজনের পক্ষে আনুনার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক নয় কী? বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র কয়েক ধাপ সিঁড়ি, একটুখানি বারান্দা, তার পরেই রান্নাঘর।

অমরেশের মনে পড়ে এক রাত্রির একটি দৃশ্যের কথা। দোতলায় তিনখানা ঘর। একটি তার শোবার ঘর, একটি তার পড়াশুনো করবার জন্যে, তৃতীয়টি অতিথিদের জন্যে। সামনে দিয়ে অপরিসর বারান্দা, তার ওদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে অ্যাটিকে। এই অ্যাটিকেই আনুনা থাকে। আগে এখানে থাকতো তার নিজের আঁকা ক্যাম্বিসের ওপর নানা ধরণের প্রতিভার তলাশ, যখন সে মনপ্রাণ দিয়ে শুধু চিত্র-শিল্পী হতে চেয়েছিল। সে-গুলোতে একদিন অগ্নিসংযোগ করে সে মাত্র রূপ-লোভী হিসেবে ঘরসংসার গুছিয়ে বসলো, এবং ফ্রান্ হক্-এর আর্ম্ ধরলে উইক্-এণ্ড্ কাটানো ক্রমে নিয়ম হয়ে উঠলো। সেই সময়ে অমরেশের এক আলমানী কবি বন্ধু আনুনাকে পাঠিয়ে দিলে তার কাছে। তারই বচনে, পাঠিয়ে দেয়—Ein maedchen fuer alles.

আনুনা এদিকে এসে পৌঁছলো সন্ধ্যার পর। আগের দুদিন সারাক্ষণ ট্রেনে কেটেছে, ট্রেনের ক্লান্তিতে তার পা টলছে, তার

বোঝে না। তার অনর্গল জার্মান কথা থেকে অমরেশ মাত্র একটিকে কতকটা চেনা বলে খপ্‌ করে ধরে ফেলেছিল, যে-কথাটা জার্মানীর হোটেলে সে প্রায়ই শুনতো—Schlafzimmer, শোবার ঘর।

আন্না বলে—Bitte, mein Schlafzimmer. অমরেশের কানে আসে শুধু Schlafzimmer. বুঝতে পারে না, হঠাৎ সে শয়ন-কক্ষের খবর নেয় কেন, তবে হয়তো কাজের মেয়ে এখনই প্রভুর বিছানাটা করে ফেলতে চায়। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে আপন শয়ন-কক্ষের দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার তার সময় নেই। আজ তার শাপাদের নিমন্ত্রণ। ইংরেজীতে আন্নাকে সে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করে, আজ তার কাজ করবার দরকার নেই, কাল থেকে করলেই হবে। আজ তার শাপাদের নিমন্ত্রণ, নীচে রান্নাঘরে আহারের জন্যে খাবার আছে, সে যেন তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আন্না তার এক বর্ণও বুঝতে পারে না, কাঁধ-দুটো তুলে সে ইশারায় বলে, বোঝে না। নিরুপায় হয়ে অমরেশ কালোয়াৎদের মত একটা কানের তলায় হাত রেখে, মাথা হেলিয়ে কৃত্রিম নাক ডাকিয়ে বুঝিয়ে দেয়—Go to sleep, Schlafen, ja?—Danke Jhnen vielmals, ja, ja, ich bin so muede! ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—ja, ja, gewiss. Danke, danke! অমরেশও তাড়াতাড়িতে Aufwiedersehen-এর বদলে বলে, Danke. পরমুহূর্তেই বাইরে থেকে সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ছোটে স্টেশনের দিকে।

রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে ক্লান্ত অমরেশ কোন রকমে টলতে টলতে ওপরে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের দিকের জানলাটায় পর্দা টানা, বেড্-কভারটি পরিপাটি-রূপে পাট করে পাশের চেয়ারের ওপর রাখা, আর তার বিছানায় শুয়ে পথশ্রান্ত, বিধ্বস্ত আন্‌না! শোবার আগে ঘরের দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করতে বেচারীর মনে নেই।

তখন গরমকাল, নিচের ড্রইংরুমে সেটী-র ওপর অমরেশের রাত কাটলো। একটা কথার ভুলে সে-রাত্রে তাদের মাঝে যে একটা ভুলের সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তিটা অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছত কি না, অমরেশ আজ এই মেঘ-থমথমে সকাল-বেলায় শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলো। ঘটনার পরের দিন আন্‌নার ভুল ভাঙাবার সময়ে তাদের দুজনেরই মনে যে-দৃশ্যটা প্রচ্ছন্ন রয়ে গেল এবং যে-কথা তারা কেউই উল্লেখ করলে না, তিন বছর আগেকার সেই রাত্রের সেই দৃশ্যটা দুজনের মনেই আজও সমান সজীব। একজন দেখেছিল, অপর জন জানতো তাকে দেখেছে। দুজনের মনের মাঝখানে এতবড় একটা সেতু থাকছায় দেখে না। তাদের মনের এই গোপন সেতু পার হলেই তো একজন আর একজনের কাছে অনায়াসে এসে পৌঁছতে পারে! থালার ওপর ঢেকে চাপা-দেওয়া খান-আটেক গরম-গরম টোস্ট্, নিয়ে আন্‌না ঘরে এসে ঢুকলো। এবার সে দরজায় করাঘাত করলে না, আসতে পারে কি না, সে কথাও জিজ্ঞেস করলে না।

সকালবেলায় দরজায় টোকা না দিয়ে ঢোকার পথটাকে যে-সব ছোট-খাটো সংকট আকীর্ণ করে রাখে, আন্না সেদিন হয়তো স্বেচ্ছায় সেগুলোকে বরণ করে নিলে, অমরেশের মনে হলো। হয়তো এরকম ব্যবহার শোধ-বোধের একটা ফিকির। লেন-দেন হতে হলে দু-পক্ষেরই প্রাপ্য ও দেয়-র হার সমান সমান না হলে লাভ-লোকসানের অসামঞ্জস্য থেকে যায়, পণ্য-মূল্যে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতিতেও তাই নয় কি? অমরেশের মনে হয়, আন্না আজ যেন একটু বেশী অধোমুখ, বিছানার খুব কাছে সরে এসে টেবিলের ওপর রেকাবে সে ঐ Vim-এ হাজা আঙুলগুলো দিয়ে টোষ্টগুলো একটি একটি করে সাজিয়ে দিচ্ছে। পিয়ানো-কর্ডের ওপর ঐ আঙুলগুলো, অমরেশের আবার গা শির্-শির্ করে ওঠে। এপ্রনের গলার কাছে আন্নার বুকের সূক্ষ্ম-কোণ দেখা যায়, হাতের, মুখের মসৃণ চামড়া, সুপরিমিত কটিদেশে এপ্রনের ফিতের আলিঙ্গন, পেছনদিকে বাহারে ফাঁসের গাঁট, বাহুর কুটিল রেখা একটির সঙ্গে একটি এমনভাবে এসে মিশেছে যে, মনে হয় আপেলের খসড়া, মুখখানি ভরাট, মাংস চর্বির পাহাড়-ডাঙ্গা ওজন নেই, গালের টোল দুটির গভীরতার জন্যে যতটুকু দরকার, চাপার খেয়ের উর্বর রক্তের দৌড়-ঝাঁপের যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী এক তিল উদ্বৃত্ত মাংস আন্নার দেহে নেই। অমরেশ ঘাঁটিয়ে ও রূপ-লোভী হয়েও এমন অঙ্গ-সামঞ্জস্য কোথাও দেখেনি। তেমন্ ত কিশোর শরীরের যেটুকু আন্দাজ করা যায়, তার মধ্যে শুধু ইতালীয় ধরণধারণ। হবে না? অন্ত

ময়দা আর অলিভের তেল থেকে ইংরেজ মেয়েরাও দু-মাসে বাঙ্গালী মেয়েদের মত হয়ে উঠবে। ও তোমার বত্তিচেলী, দা ভিঞ্চি, সবারই এক অবস্থা। মাংসের বোধ আছে কিন্তু অ্যাঞ্জেলোর মত পেশী-বোধ নেই। অমরেশের মনে হয়, একমাত্র অ্যাঞ্জেলোই মানুষের দেহ আঁকবার অধিকারী। কারণ তাঁর শরীরতত্ত্বে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। স্টুডিও-কে অ্যানাটমিয়া-ঘরে পরিণত না করলে জগতের মিউজিয়মগুলোতে শুধু পোটোপাড়া, কুমোর-টুলীর চলচলে মুখ, থলথলে শরীরের প্রতিমার হেরফের জমা হবে। অমরেশের গা ঘুলিয়ে ওঠে, ময়দা আর অলিভের তেল, আটা ওর পিটু, ভাত আর সরষের ফেন। আন্নার স্বাস্থ্য এদেশের বাধা মানে না। তার শরীরের বাঁধুনি তার প্রতি অঙ্গে মাংস-পেশী, শিরা-উপশিরা, রক্ত-মজ্জার একটি স্বাভাবিক, আবিষ্ট টঙ্কন ফুটিয়ে তোলে। চরম অনুভূতির টঙ্কন।

আন্না টোস্ট্‌ মাখিয়ে পেয়ালায় কালো গাঢ় কফি ঢালে, তারপর তার সঙ্গে মেশে ঘন ক্রীম। বাদামী কফির সঙ্গে আ-পীত ক্রীম অবাধে মেশে। ক্রীম চলে যায় তলায়, তারপর একটু একটু করে ওপরে ভেসে ওঠে। হয়ে ওঠে এক পেয়ালা কফি, বাদামী-হলুদে, পীতাভ রক্ত, রক্তাভ পীত। আজকের এই কফি-ক্রীমের বর্ণ-সঙ্কর অমরেশের মনে এক অ-দৈনন্দিন ভাবনার সৃষ্টি করে। সে তাকায় নিজের হাতের দিকে, তারপর আন্নার বাহুর শ্বেতরক্তিমার ক্রীম-রঙের মসৃণ চামড়া তার চোখে পড়ে স্পষ্ট হয়ে, অন্যদিনের চেয়ে স্পষ্টতররূপে।

বর্ণসঙ্কর কথাটা সম্বন্ধে যে-সংস্কার ও প্রাগ্‌বিচার পুরুষানুক্রমে শ্রীভগবান থেকে আরম্ভ করে মনু ও মনুর বড়-মেজ-ছোট-খাটো অনুচরবর্গের শাসন, অনুশাসন, অভিশাপনের আওতায় তার মনের খাঁজে খাঁজে বাসা বেঁধেছিল, তারা সবাই একে একে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসে অমরেশের আজকের এই মেঘ-থমথমে সকালবেলাকার অন্যথা চিত্তবৃত্তির বিচার করতে বসে। তার কানে-কানে কে যেন পণ্ডিতমশায়ের পূর্ববঙ্গী উচ্চারণে ফিস্‌-ফিসিয়ে বলে—জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। ভারতবর্ষের এত বড় দুর্দিনের সম্ভাবনা শ্রীভগবানও হয়তো সইতে পারতেন না—অর্জুন এই ঘোর বিপদের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, যদি তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন—জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। কাফি আর ক্রীম বিশুদ্ধ পেয়ালায়, তা মুখে তুলুক ইংরেজ, ফরাসী, রুশী, বুলগার, বাঙালী, মাদ্রাজী, তুর্ক্, আরব, চীনা, এস্কিমো, সামোয়েদ্, মালয়, হাব্‌শী, দুশ্মোন, সাঁওতাল, ইরাণী, তুরাণী, হাবাসী, ফিন্‌স্, লেপ্‌চা, লাপ্‌প্—কিন্তু কাফি-ক্রীমের চামড়ায় চামড়ায় যেন মিল না হয়, হে পরমেশ্বর, জায়তে বর্ণসঙ্করঃ!—Shocking, my dear!—There was a girlie from Sharky. And she met a darky. She had three brats, a white, a black and a khaki!!—Ha, ha, ha! Funny, isn't it?—Look here, Sarah, I must warn you beforehand lest you

*"ম-ভুক্", বঙ্গদেশের উত্তরপ্রান্তের উপভাষা।

should repent later. Keep these Indian boys at arm's length. Don't you know, er, I mean, you may like their brown skin and dark eyes, I dare say they are handsome in a way, but you know what I mean.—Yes, ma'am I knau igzactly woch you mean ma'am ! I guess I better be careful any'ow !—অমরেশের মনে পড়ে লিঙ্কন্‌স্‌ ইনের কমন-রুমের মস্করা আর তার এক পুরানো ল্যাণ্ডলেডী ও নব-নিযুক্তা পরিচারিকার বাক্যবিনিময়। কাঁহাতক বর্ণসঙ্কর্‌।

অমরেশের পেয়ালায় কাফি-ক্রীমের ওপর ঠাণ্ডা সর পড়েছে, টোস্ট্‌ জুড়িয়ে গেছে, মাখন গলে থল্‌থল্‌ করছে, বেকন ভিজে পাঁপড়ের মত নেদ্‌-নেদে। আন্নার ব্রেক্‌-ফাস্ট সাজানো আর শেষ হয় না! এপ্রনের আঁচল দিয়ে ট্রের কানা মুছে সাফ্‌ করে দেয়। বাহু সঞ্চালনে তার বুকের যুক্ত-কোণের বাহুবন্ধের কুঞ্চন-প্রসারণ। কাঁহাতক বর্ণসঙ্কর্‌। অমরেশের আবার মনে পড়ে সাক্ষোর দুটি দৃশ্য—দেখি দেখি, কী সুন্দর চোখ! এর মধ্যেই—déjà ! অমরেশ আন্নার বাহুর ওপর নিজের হাতখানা রাখে, বলে—Coffee and cream funny isn't it, Anna ?

Okh ja, I like zee kolor fon koffee ferry much, Mr. Ray.

Do you ? And I like cream.

Do you ? Funny, isn't it ?

অমরেশ আন্নার হাতখানা তার নিজের দিকে টেনে নিতে যায়। আন্না প্রতিবাদ করে—

Not now plis, Mr. Ray, I haff zo much wo-ork to do, plis not now.

When ?

আন্না চুপ করে থাকে।

When ?—অমরেশ তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করে।

Vell, I don't know. Prhafs after lunch.

চুক্তির ওপর চুম্বনের শীল-মোহর। অমরেশ তাড়াতাড়ি পোষাক পরে। তারপর রেনকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ছড়ি ও টুপির কথা মনে থাকে না। বারোটা বাজে প্রায়। একটায় লাঞ্চ্। আন্না যদি রাজী হয় তো আজ এক টেবিলে লাঞ্চ্ খেলেও চলে। কেই বা দেখতে আসছে? পাশের বাড়ীর Mrs. Ramsbottom-এর বাগান থেকে তাদের খাবার ঘরের ছবিগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। পর্দা টেনে দিলেই চলবে; তার ঘরে, না আন্নার রোমান্টিক অ্যাটিকে? অ্যাটিকই ভালো। আর্ল্-এর মাঠে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চাষার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, ফিকে হলুদ রোদ্দুর, মাষ্টার্ড্ আর তিসিপার রঙের তার ফ্রক, লাল কালির রং রুমাল, মাষ্টার্ড্ আর নীল কালি মিশিয়ে যে সবুজ হয়েছে, তাই দিয়ে মাঠ আর দূরের গাছের সারি। ছাকা খান্ হক্ বলে অনায়াসে চালানো যেতে পারে। পায়ের দিক থেকে ছবিটা আঁকা হয়েছে। শুধু এই-

টুকুতেই কান্ হক্-এর শিল্পের উদাসীন সন্ন্যাস-বৃত্তির অপলাপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় আঁকিয়ে হলে সেটা হতো না। মাঠের ওপর একটি মেয়ে পা ছড়িয়ে, বুক চিতিয়ে ঘুমোচ্ছে, তার ঘুমের আরাম, তন্দ্রার আবেশ, মাটির ওপর তার এলানো অঙ্গের আত্মসমর্পণ, এছাড়া শিল্পীর আর কী দেখবার আছে? অমরেশের আঁকা ছবিখানাতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাথর-কাটা কাম আর কাশীর নেপালী শিব-মন্দিরের কাঠে-কোঁদা লালসার রেশ। হবেই বা। কাম-শাস্ত্রের দেশ আমাদের, আমরা প্রাচীন দেশের মানুষ, দেহের ক্ষুধা বেশী না হলেও সেই বুভুক্ষার ফেনিয়ে ফেনিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খুঁটিনাটির কল্পনা, বিছানায়-পড়ে-থাকা রোগীর লোনা-মাছের কালিয়ার দিবাস্বপ্ন, বৈঠকখানার চৌকির ওপর হুঁকোর ধোঁয়া দিয়ে সেঁকা কাম। Smoked herring, kipper, হয় না হয় জিজ্ঞেস করো বুড়োটাকে। অমরেশের মনে আবোল-তাবোল কথাগুলো আলবোলার ধোঁয়ার মত দিক্-ভ্রষ্টভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। কলকাতার শিল্পী পাড়া থেকে সে আবার এপিং ফরেস্টে ফিরে আসে এক মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কেটে-যাওয়া ঘুড়ীর হাত-সুতোর মত ছিন্নতার স্বাদ পায় তার মনের লাটাইয়ে। আর্ল্-এর চাষার মেয়ের ছবিটা, যেটা আটিকে ছিল, তারই আঁকা, হয়তো বিশ্ব প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেত। অমরেশের বয়েস তখন এখনকার চেয়ে অল্প ছিল। কানের কাছে চুলে পাক ধরেনি, ছবিখানাতে যে কাম ছিল, তারই মনস্কাম কি আর পূর্ণ হতে চলেছে? যে-মেয়েটিকে

দেখে ছবিখানা এঁকেছিল, তাকে কল্পনায় অধিকার করা যত সহজ, বাস্তবে স্পর্শ করা কি তত সহজ ? ভালোবাসা না পেলে এদের দেহ থাকে আড়ষ্ট, মনের দোরে হুড়কো-দেওয়া। ফুল-শয্যার আগে চাই কোর্টশনের সুশিক্ষা। ইউরোপে ভারতীয় যুবকদের না যাওয়াই ভালো। তারা বুভুক্ষু দেহে-মনে, সর্বত্র, সর্বাঙ্গে। ঝটপট কাজ সারতে চায়, এ পাতে মাংসের চপ, চিংড়ীর কাটলেট, রুই মাছের কালিয়া, কৈ মশাই দিন না এদিকে, হুশ-হাশ, হাপুস-হুপুস, স-স-স—ঢেউ-উ ঢেউ-উ, কাল উঠবে চোঁয়া ঢেকুর, বেড়ে রান্না হয়েছে ! অমরেশ তার সখীদের কাছে স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে এ ধরনের কুৎসা কম শোনেনি—They're just a spot too greedy, impatient—হবে না ? হাজার হাজার বছর ধরে যে ক্ষুধা জমে উঠেছে দেহের স্তরে স্তরে, স্নায়ুমণ্ডলীর খাঁজে খাঁজে। জেলের ভাত-খাওয়া সত্যাগ্রহীকে সটান এনে ছেড়ে দাও দেখি বিয়ে-বাড়ীর ভোজের পংক্তিতে ! খেতে সে বেশী পারবে না, কিন্তু খাওয়ার সে কি দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি ! খ্যাংলা কুকুর আর হ্যাংলা ভিখিরীর মত। আর্ল-এর চাষার মেয়েকে সে এঁকেছিল শুধু তার দেহের বুভুক্ষা দিয়ে নয়, তা না মানলে চলবে না। যে রূপ-সমালোচক সন্ন্যাস-বৃত্তির কথা তুলেছিলেন, তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্য জানা নেই। নেংটী-পরা, স-শৃঙ্খল নাগা সন্ন্যাসীদের দেখে কাম-স্পৃহ ! বিদেশীদের চক্ষু dough-nut। মন্তব্যটা মন্দ নয়, ভারতীয় আত্মার আসংবৃত্তি পুনরুক্তি করে হাততালি পাওয়া যায়। আর্ল-এর মেয়েটি বদলে

গেল আল্‌পাসী মেয়ের রূপে, মাষ্টার্ড আর নীল কালিতে আঁকা মাঠ হবে শাদা ধব্‌ধবে বিছানা, আন্‌নার নিজে হাতে কাচা চাদর, তার অ্যাটিকে। তাকে বিয়ে করা চলবে না, আন্‌নাও তা চায় না, সে বিয়ে-করা নেকী বৌ নয়, ম্যারেজ-সার্টিফিকেট নিয়ে হবে কী? কাগজের টুক্‌রোয় লেখা সম্মতির ছাড়পত্র দেখিয়ে সে খোরপোষের দাবী করবে না। বাবা জার্মান মা ফরাসী, যেমনি খাঁটি তেমনি চটুল। At my own risk—Mais parle-moi d'amour! আন্‌না যে আজ তিন বছর পরে এক কথায় নিজেকে অমন সহজভাবে সঁপে দিতে রাজী হলো, তার মধ্যে শুধু কি তিন বছরের অন্তঃশীলা কামনাই বহিঃস্রোতা হয়ে উঠলো? বিশ্বাস হয় না। ভালোবাসা চায় বৈ কি! ঝটপট্‌, মিষ্টি-মিষ্টি, তাড়াতাড়ি, পাছে ফুরিয়ে যায়। আল্‌পাসী চাষার মেয়ের উর্বর রক্ত বুড়োটে ভোগ-লালসার তীব্র প্রতিবাদ করবে। কেন অবরোধের কি তা জানা নেই? আজ সারা সকাল ধরে আন্‌না ভাববে তাকের পর একটি মধুর, অ-দৈনন্দিন সম্ভাবনার কথা, দুপুর গড়িয়ে যাবে, তবুও তার স্বপ্ন ফুরোবে না, সুদূর-গামী পথ তার মনের সুমুখে চক্রবালে গিয়ে মিশবে, পথের ধারে ছোট ছোট বিস্ময়, হলদে পাকা খেতে লাল-টুকটুকে পোস্ত ফুল আত্ম-গোপন করেছে রাই-শস্যের মাঝে, ছোট্ট এক ঝাড় ভুলো-না-মোরে ফিকে বেগুনী রঙের, শুক্‌নো দাণ্ডেলিয়ঁর তুলো ফুঁ দিয়ে সঙ্গীদের মুখের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া, শান্তির ছুতো করে চুমু দেওয়া-নেওয়া, তারপর নবকর্ষিত ক্ষেতের ওপর এক ঝাড় পাকা

ঘরের আড়ালে, পথিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা শোবে পাশা-পাশি, নীল, উদার আকাশের তলায়, সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবে, তারা উঠলো একটি একটি করে, কে কটা গুনতে পারে, দেহের অবসাদে পড়ে চাঁদের আলো, চাঁদ ঢলে পড়ে ক্লান্ত রাত্রির বুকে, ফিকে ভোরের চোখ রাত-জাগায় হলো ঝাপসা, শিশির-ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ী-ফেরা তাড়াতাড়ি, দুজনে দুপথ দিয়ে, হয়তো খুঁজতে পাঠিয়েছে, বাপকে বলবে কী, কাফি-রঙের চামড়া, কাফি আর ক্রীম, দিক্ মা বাপ্ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, তার দেহের অধিকারে বাপের হুমকি, রক্তের ডাক হুমকি মানে না। আর্ল-এর বাদামী-সবুজ মাঠ, আলসাশী চাষার মেয়ের হাতে কাচা নিখুঁত শুভ্র বিছানায় চাদর। অমরেশের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অমরেশ প্রকাণ্ড ছাতার মত লাইম্-গাছের তলায় বেঞ্চটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সাড়ে বারোটা বেজেছে। একটায় লাঞ্চ্। বেড়াতে বেড়াতে এপিং ফরেষ্ট্ ছেড়ে সে বড় রাস্তায় উঠে এলো। চওড়া রাস্তা লন্ডনের দিকে চলে গেছে, পাশে একটুকরো ঘাস-জমী, একপাশে বেঞ্চী পাতা সামনের দৃশ্য দেখবার জন্যে হয়তো ততটা নয়, যতটা আধা-বয়সী বা বুড়ো আইবুড়ো কেরানীদের শিকার ধরবার জন্যে, দাও ভালো টোপ্ তোলো টপাটপ্, Come to supper at Lyons Corner House, তার ওপর five bob, কচিৎ half a guinea, দিন বুঝে, শনিবারে চড়া বাজার, province-থেকে-আসা ব্যবসাদাররা খুশী হবে দেব এক

guinea, ডাক্তার-ব্যারিষ্টারেরা কামাক্ বেশি ! ঘাস-জমীটা সতীর মত নিষ্কলঙ্ক দিনের আলোয়, রাতে তার অন্য চেহারা, অমরেশ যাকার ঘর দেখেছে, তার হাসি পায়, রাতে ললিতা, প্রভাতে নমিতা, পুরোনো ছাতা-পড়া মন্থরা, উপমাটা কার যেন, খোঁচ সহজে ধরা পড়ে, চুলোয় যাকগে ! নমিতার বুকের ওপর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ভিড়, কুলটা সিঁদুর পরে হয়েছে গৃহিণী, মেট্রেস্ হয়েছে স্ত্রী, ম্যারেজ-সার্টিফিকেট। হাওয়া খাবার পক্ষে ভারী সুবিধা ঘাস-জমীটা, ছেলেমেয়েগুলো বাড়ীতে ঢুপোঢুপি করছিল, লাঞ্চ, পর্যন্ত স্বামীরা তাদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ঘাস-জমীটার ওপর কচি বয়েসের খেলা-ধুলো, কাঁচা বয়েসের লীলাখেলা, ডাঁসা বয়েসের কামলীলা আর পাকা বয়েসের মনস্তাপ।

স্বামীদের ঝুলো গাল, রেনেট্-আপেলের মত সোপাচে-পাকচে, দাঁতের দাগ বসানো, কার না লোভ হয়, বাঁধানো দাঁত যাদের তারা ছুরী দিয়ে কেটে মুখে পুরবে, আপেলের খোসায় ভিটামিন, তবুও না ছাড়ালে চিবোবে কে, কাঁচা দাঁত বাধা মানে-না, কাল বুঝি maids'-afternoon-out ছিল ? ইংরেজ মেয়েরা ম্যারেজ-সার্টিফিকেট চাইত, আর না হয় খোরপোষ ; মার্কিন, বেলজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমারী, ফিন্স্, এস্তোনী, রেডস্, এরা চায় মনের খোরাক আর দেহের সবটুকু উজাড় করে দেওয়া-নেওয়া, দেহের শয়াশনে না বসলে মন ওপরে ওঠে না, ইংরেজদের মত মনোভাবের জিহ্বা-হৃদের চুক্চুকানি এদের থাকে

নেই, দেহের রুচি, রসনা ও অশনের আনন্দ এদের কাছে সব চেয়ে বড়, নিজে খাবে তার পর বদ্‌হজম হলে কাঁচা ছেলেদের পাকা বাপেদের কাছে ক্ষতিপূরণ চায় না এরা, সত্যি-মিথ্যে ইংরেজ ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে দেখো। Maids'-afternoon-out এরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, লন্ডন, এডিনবরা, ডাব্‌লিন, অ্যাবেরিস্টুইথে পাড়ায় পাড়ায় নীল আর লাল রক্তের বেগুনী সন্তানদের সংখ্যা বেড়ে উঠতো রক্তবীজের মত। বিদেশী স্থানীগুলো safe outlet, শোননি একথা পাকা বাপের কাছে? কাঁচা ছেলে আর পাকা বাপের মাঝে দালালীও দেখোনি? তবে, বিলেতে বসে করেছো কী এতদিন?

অমরেশ দৃশ্য দেখবার ছুতো করে ঘাস-জমীর ওপর বেঞ্চটায় এসে বসে। পাশে একটি স্থানী আড়-চোখে তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে সোয়েটার বুনছে, এক ঘর, দুঘর, তিন ঘর, চার ঘর, টানা চলেছে, তারপর পোড়েন. এক, দুই, তিন, গোনার শেষ নেই। ঘর গুলিয়ে যায় মেয়েটির, বিড়-বিড় করে বিদেশী ভাষায় কী একটা কটু-উক্তি করে, হয়তো এস্তোনী, মুখ দেখে তাই তো মনে হয়, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, দুধ-ভরা বুক, চোখ দুটো একটু ওপরদিকে টানা, ঈষৎ চাপা নাক, কাঁচা সোনার ওপর লালচে আভা রং, একটু লেপ্‌চানীদের আদল পাওয়া যায়, তরাই-এ চা-বাগানে যে-সব লেপ্‌চানীরা কখনো কখনো কুলীগিরি করতে, আসতো, অনেকটা তাদের মত দেখতে, অমরেশের মনে হলো চেহারা দেখে আর্য বলে বোধ হয় না। হয়তো ল্যাপ্‌স্‌ রক্ত

পায়ে আছে। লাপ্‌শ্‌ আর লেপ্‌চা এক কি না কে জানে? কাঁচা বয়েসে যে লেপ্‌চানীর কাছে চুমনের বদলে পেয়েছিল চড়, এ মেয়েতো কতকটা সেই রকম নয় কী? চপলা উমা শিবের অনাশক্তিতে চঞ্চলা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বাঙালী ছেলের বাছুরের মত গা চাটা সইবে কেন? মেরেছিল এক চড়! সেই অমরেশ আর এই অমরেশ! প্রেম-করার kunst তাকে দস্তুরমত কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল একটি জার্মান মেয়েমেম্‌-এর কাছে; নাচতে শেখার মত এ-জিনিষটাও শিখতে কম কসরৎ করতে হয় না। এস্তোনী কি ফিন্‌ মেয়েটির দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে অমরেশ মনে মনে কাম-ক্রোধের সোপানগুলি একটি একটি করে অতিক্রম করে চললো। মনের আত্মশুদ্ধির ক্ষমতা না থাকলে সমাজ অসম্ভব হয়ে উঠতো; শিষ্টতা, ভব্যতা, ভদ্রতা, খাওয়াদাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্রিজ-খেলা, ওকালতি, মাষ্টারী, পরকীয়া-চর্চা, ধর্ম, আচার, মন দেওয়া-নেওয়া, সভ্যতার সব অঙ্গগুলি বিকল হয়ে উঠতো। আল্‌-ক্লিভের ওদিকে রাখো মনের কথাকে, তবে চলবে সমাজ, সভ্যতা। অমরেশের ভারী মজা লাগে, পাশের মেয়েটা সম্বন্ধে সে এমন কথা নেই যে কল্পনা করছে না, অথচ বেচারী কি তার এক বিন্দুও জানতে পারছে? মেয়েটাকে কিন্তু ভারী অদ্ভুত লাগছে। তার তির্যক চোখের বাঁকা চাহনি অসচ্চরিত্র বলেই অমরেশকে এক অদ্ভুত শক্তিতে আকর্ষণ করছে। এক জাতের পুরুষ অন্য জাতের মেয়েদের ওপর আকৃষ্ট হয়, আর মেয়েরা পুরুষদের ওপর। স্ত্রী, স্বপুরুষ

ফরাসী জেনারেল আনামী, মালয় মেয়ের প্রেমে মজেছে, ইংরেজ মেমে নিগ্রোর প্রেমে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, অমরেশ নিজে দেখেছে। বাঙালীদের কথা ছেড়ে দাও, তাদের দিনান মেলে মেলে, শত-শত বছর ধরে যে কাফ্রিতে ক্রীয়েতে মিশেছিল ভারতবর্ষে, এখন তার ওপর আকতি এসেছে। "কাফে-ক্রেম" হতে চায় ক্রেম্ "ক্রেম", তাই মাখো স্নো আর ক্রীম, কমলা-লেবুর খোসা আর সব, মাখো শাদা পাউডার, হয়ে ওঠো বেগুনী, দেখোনি ফিরিঙ্গীদের খিঙ্গী মেয়েদের?

এস্তোনী না ফিনন্ মেয়েটি পশম আর কুরুশ-কাঠি ব্যাগে ভরে বেঞ্চী ছেড়ে উঠে গেল। অমরেশ একবার ভাবলে তার অনুসরণ করবে কি না। পেছু নেওয়ার সব ছলই তো তার মুখস্থ। মেয়েটি তাকে সারা এপিং ফরেস্ট ঘোরাবে নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো সে তার তির্যক চোখের বাঁকা চাহনি হেনে উঠে গেল। সারাদিন বনে বনে ঘুরে ঘুরে বিকেলের দিকে সে যে তার সঙ্গে ঐ "চা-বাগানে" মালবেরী গাছের তলায় বসে ক্রীম দিয়ে ষ্ট্র-বেরী আর কারেন্ট-জ্যাম্ দিয়ে গরম ক্রাম্পেটের সঙ্গে হাল্কা চায়না টী খুঁটের মত ঠোঁটে তুলবে, তা অমরেশ উক্ষমন্ত্রণেই জানে। তারপর সন্ধ্যার সময় সে খেলায় ধরা দেবে নানা ছল করে। কচি বীচ্-এর আওতায় মাটিতে বেছানো ফিকে বেগুনী রঙের ভুলো-না-মোরে আর নীল ব্লু-বেল্-এর ফুল-শয়ন। বাঁকা চোখ ওপরদিকে টানা, বুক-ভরা বুক। অমরেশের মনে পড়ে আন্নার কথা। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। সে

বেচারী তার জন্যে লাঞ্চ্ সাজিয়ে বসে আছে এতক্ষণ। বাড়ী ফেরা যাক্। অমরেশ মনে মনে ভাবে, লাঞ্চের পরে সে আন্নাকে পাঁজা-কোলা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপর-তলায় নিয়ে যাবে। Enfin !—Déjà ? ছেলেমানুষী। হোক্ না। মেঘ-থমথমে দুপুরে বাড়ীর ভেতরটায় গায়ে কাঁটা-দেওয়া, নেশা-খোরের চেতনার মত আবিষ্ট অন্ধকার, আন্নাকে বুকে চেপে ধরে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা !

ঘাস-জমীটার ওপর দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। ছেলেদের ছোট্ট পুতুল-নাচের রঙমঞ্চ কাঁধে নিয়ে জমীটার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর বাজিকর। সঙ্গে একটি ছোট্ট ফক্স্-টেরিয়ার, গলায় ঘুঙুর বাঁধা। কুকুরটা দুপায়ে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে কৌতুক সঞ্চার করে। তারা সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ায়, সঙ্গে আসে ধাত্রীর দল। বাজিকর কাঠের পায়ার ওপর ছোট্ট রঙমঞ্চটা বসিয়ে তার পেছন-দিকে কাপড় ঢেকে দেয়। তারপর চিৎকার করে হরবোলার ডাক ডাকে, মোরগ-মুরগী, গরু, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চড়াইপাখী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে আস্তে আস্তে বিস্ময় ফুটে ওঠে, বিদেশিনী ধাত্রীর দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে হাসতে। বাজিকর দু-এক জনের দিকে তাকিয়ে চোখ ঠারে, তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পথ-চলা লোক জড়ো করে আস্তে আস্তে। চলে এসো, চলে এসো, পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর খেলা! হরবোলার বুলি! কুকুরের ফক্স্-ট্রট! কুকুর আর বাঁদরের একসঙ্গে লাঞ্চ্ খাওয়া!

বলতে বলতে বাজিকর ঝাঁপার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট বানরের বাচ্চাকে বের করে মাটির ওপর ছেড়ে দেয়। বানরটা দাঁত খিঁচিয়ে কিচ্-কিচ্ শব্দ করতে করতে লাফ দিয়ে রঙমঞ্চের বাক্সটার ওপরে গিয়ে বসে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা তার রকম-সকম দেখে হাততালি দেয় আর হাসে। অমরেশ তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, অনাবিল কৌতুকে তাদের বিস্ময়-ভরা চোখের কোণে, ঠোঁটের রেখায়, চিবুকের টোলে, আর ফুলো-ফুলো গালে হাসির স্ফুরণ পড়েছে। ছোট্ট একটি দু'বছরের মেয়ে, পারা টেডি-বেয়ারের মত পোষাক-পরা, কপালের ওপর এক ঝুমকো সোণালী চুল, হাততালি দিয়ে হাসতে-হাসতে দু-একবার লাফাতে চেষ্টা করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, আর্দালী তাকে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে পোষাক থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলে। মেয়েটি কর্তব্যের খাতিরে একবার ঠোঁট উলটে কাঁদতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পরক্ষণেই ফক্স্-টেরিয়ারের ফক্স্-ট্রট্ দেখে অন্য-অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। বাজিকর ঘণ্টা বাজানো থামিয়ে রঙমঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ডান-হাতটা কাপড়ের তলায় চালান করে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই রঙমঞ্চের পর্দা সরে গেল। মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্চ, টিয়া-পাখীর মত বাঁকানো নাক, আর দ্বিতীয়ার চাঁদের মত চোয়াল আর থুৎনী, ওপাশে জুডী, তন্বী তরুণী, ফিট্-ফাট্, রূপ-সজ্জা দেখেই মনে হয় মেয়েটি পাঞ্চের দাম্পত্য-জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। পাঞ্চ আর জুডী দুজনেই ঘাড় নীচু করে এক অদ্ভুত

পুরুষ ও স্ত্রীর গলায় সমবেত জনমণ্ডলীকে অভিবাদন জানায়—Good morning, ladies and gentlemen, good morning children। ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, পরে কেউ কেউ প্রত্যুত্তর দেয়—Good morning। তাদের মুখের ওপর হাসির কুঞ্চন সরে গিয়ে বিস্ময়ের রেখা পড়ে। মানুষের মনের আদিম অনুভূতি বিস্ময় ও কৌতুক, ছোট্ট ছোট্ট মানবশিশুদের মুখের ওপর মেঘ ও রৌদ্রের মত পরস্পরকে অনুসরণ করে চলে। আমাদেরও মনে হয়, জীবজগতের মূলে যেমন বুভুক্ষা ও সঙ্গম, তেমনি শিল্প-সৃষ্টির আদিতে বিস্ময় ও কৌতুক। শিল্প-বোধী আমাদের চোখের সুমুখে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্প-বোধের এই দুই আদিম নীতি আজ এই প্রথম মূর্ত হয়ে উঠলো। পাকে-অ্যাণ্ড-এর ভীম পুতুল-নাচের যাদুকর হাতের কারসাজি আর কণ্ঠস্বরের চাতুর্যে এই কুড়, অনভিজ্ঞ নর-নারীর সরল, বিস্ময় ও কৌতুক-ভরা মনগুলিকে যে-ভাবে অধিকার করেছে, অতটা সৌভাগ্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, লেখক, চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞের জীবনে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। আর্টের সমঝদার সভ্য, শিক্ষিত, বয়ঃপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ মানুষ। নেশাখোর যেমন নেশার মৌতাতে দৈনন্দিন, blasé মনকে এক নিবিড়, আবিষ্ট অনুভূতির ক্ষণেক মায়ায় আবদ্ধ রাখতে চায়, বয়ঃপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ মানুষ ঐ-ধরণের এক অনুভূতির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে চায় না কী? যে-মানুষের বিস্ময়ে মৈচে ধরেছে, কৌতুকে পড়েছে মর্চে, তারই চেতনায় এই দুটি বৃত্তির ক্ষণিক পুনরুদ্বোধনের

উদ্দেশ্যেই আজ লাখে লাখে বই ছাপা হচ্ছে, পার্কের দেওয়ালে দেওয়ালে রংচঙে ছবি, সিনেমা-থিয়েটারে মানুষের ঠেলাঠেলি, অপেরা, কনসের্ট-হল আতর আর পাফের গন্ধে বিবমিষা-কর। তাই নয় কি ? বাজিকর তার খেলা দেখিয়ে চলে। ছেলেদের এই পুতুল-নাচের নাটকে গল্প নেই, আছে শুধু ঘটনার পটপরিবর্তন আর বিস্ময় ও কৌতুকের হেরফের, টানা-পোড়েন, কখনো বা ভয়। পাঞ্চ্-অ্যাণ্ড্-জুডীর গল্প বাজিকর নিজেই জানে না। সুতরাং তার সঙ্গে এসে মিশেছে নানান্ রকমের নাটুকে কল্পনা, কখনো বা অন্য কোনো ছেলেদের নাটকের কোনো ঘটনা ; এইমাত্র জুডী এসে পাঞ্চের গালে চড় বসিয়ে দিলে। ছেলে-মেয়েরা সে-দৃশ্যে কৌতুকে ফেটে পড়ে। তার পরই জঙ্গলের পটভূমি। কী ভীষণ জঙ্গল ! পাঞ্চ্ ও জুডী জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেমেয়েদের মনে বিস্ময় ও ঘটনা-পারম্পর্যের দুর্দমনীয় ঔৎসুক্য জেগে ওঠে। তারপর হঠাৎ ঠক্-ঠক্ করে শব্দ হয়। কী এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার পূর্বপ্রত্যাশায় ছেলে-মেয়েদের মন চকিত হয়ে ওঠে। গাছ-পালার ছবির পেছন থেকে বেরিয়ে আসে লম্বা একটা কাঠের কুমীর। মঞ্চ থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রকাণ্ড হাঁ করে আকাশের দিকে তাকায়। ছেলে-মেয়েদের মুখে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয়, কেউ কেউ ভয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। হঠাৎ কাঠের কুমীর খট্-খটিয়ে ঠোঁট নেড়ে এক অদ্ভুত গলায় বলে—Gim'me a penny, gim'me a penny, will yah ? ছেলেমেয়েদের ভয় ভেঙে

যায়, মাঠের দূর্গীদের কথা শুনে তারা হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে লাফায়। অমরেশও আপন অজ্ঞাতসারে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চিৎকার করে হাসে। খেলা থেমে যায় একটু পরে, গ্রামীর দল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যে-যার বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করে। সাঁঝের সময় হয়েছে, খেলা দেখতে গিয়ে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। সেড়টা বাজলো প্রায়। অমরেশও ঢালু জমী বেয়ে তার বাংলোর দিকে নামতে শুরু করলে। পায়ের তলায় সবুজ, কচি ঘাস, একটু দূরে দূরে হলদে-হলদে গর্স-এর ঝাড় দেখা যায়। অমরেশের মনের সামনে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উল্লসিত মুখগুলি ভেসে ওঠে একটি একটি করে। মনে পড়ে ছোট্ট টেডি-বেয়ারের মত পোষাক-পরা মেয়েটির কথা। মুখের ওপর অসীম বিস্ময়ের রেখাপাত আর অনাবিল হাসির ঝলক। ছোট্ট ছোট্ট দুটি হাতের হাততালি আর অনাবৃত পায়ের নাচন। মাঠের মাঝে জায়গায় জায়গায় বুনো স্ট্রবেরী, ক্র্যানবেরীর ঝাড় কোথাও বা একটা উইলো মাটির ওপর ঝুঁকে পড়েছে, দূরে এপিং ফরেষ্টের বনরেখা। প্রকাণ্ড একটা পপ্‌লার পথ আগলে দাঁড়ানো; অশ্বত্থ পাতার মত পাতা, কাঁচা, সবুজ, লম্বা লম্বা বৃন্তগুলিতে ঝির-ঝির করছে। গাছটা মিনারের মত সটান আকাশের দিকে উঠে গেছে। মূল থেকে আগা পর্যন্ত কোথাও তার একটুকু অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে না। অমরেশের blasé মনে আস্তে আস্তে এক অভিনব বিস্ময় জাগে। এর আগে কতদিন সে গাছটার পাশ দিয়ে চলে গেছে, তখন সে দাঁড়ে

কঙ্কালসার, আপন রিক্ততায় সঙ্কুচিত, বসন্তে যখন তার নবোন্মেষিত শাখা-প্রশাখা, শিরা-উপশিরায় প্রাণের প্রথম শিহরণ জেগেছে, গ্রীষ্মে যখন সে আপন পরিপূর্ণতায় আবিষ্ট, হেমন্তে যখন স্থির মধ্যাহ্নে একটি-একটি সোনারবরণ পাতা আলোর বুদ্বুদের মত ঘুরতে ঘুরতে নিঃশব্দে মাটিতে এসে পড়ে। আজ এই মাঠের মাঝখানে সরু পায়ে-চলা পথের ধারে পপ্‌লারটা অমরেশকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে। সে হাতের নাগালে ছোট্ট একটি শাখাকে বারংবার স্পর্শ করতে লাগলো, হাত, মুখ, ঠোঁট, কপাল, দিয়ে। ঠিক যেন শিশুর কোমল স্পর্শ। অমরেশের মন আস্তে আস্তে কিসের অপূর্ব আনন্দে ভরে ওঠে। সে মাঠ ছাড়িয়ে চলে এপিং ফরেস্টের দিকে। বহু-শতাব্দীবৃদ্ধ পাইন, ওক্, বার্চ্, লাইম্-এর পরিপূর্ণ পরিণতির আবেষ্টনের ভেতরকার থমথমে অন্ধকার আর নিবিড় নিরাপত্তা, জায়গায় জায়গায় কচি কচি ঘাস, তার তলায় নীল ব্লু-বেল্, কোথাও বা এক ঝাড় জুনিপার, কতকগুলো নাম-না-জানা কাঁটার ঝোপ, তার ভেতরে চলেছে সমগ্র একটি পৃথিবীর জীবন-স্পন্দন, হাজার রকমের কীট-পতঙ্গ, কেউ বাসা বেঁধেছে, কেউ শুধু গাছগুলোর তলা দিয়ে যাতায়াতের পথ তৈরী করেছে, কেউ বানিয়েছে আত্মরক্ষার সুড়ঙ্গ। কীট-পতঙ্গগুলোকে মানুষ বলে কল্পনা করলে, এই ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়গুলোকে বিশাল অভেদ্য অরণ্য বলে ভুল করা চলে। নিজেকে ঠিক তাদেরই মত ক্ষুদ্রকায় মনে করলে, তাদেরই সঙ্গে সার বেঁধে চলা যায়· জুনিপার, ষ্ট্রবেরী, রাসবেরী

আর গর্স-এর বনতল দিয়ে, তাদেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোট-বড় সমস্যার তাড়নায়, তাদেরই হর্ষ-শোক-আতঙ্কের প্রণোদনে।

অমরেশ বন ছাড়িয়ে আবার মাঠে বেরিয়ে এলো। দূরে তার বাংলো দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা চেষ্ট্‌নাটের তলায়। মনে পড়ে, মে মাসে গাছটা পাতায় ফুলে ভরে উঠেছিল, কতকটা কদম পাতার মত গাঢ় সবুজ পাতা আর শিরীষ ফুলের মত ফুল, শাদা ধব্‌ধবে, ভেতরে সোণাচে আভা। বাগানে বসে অমরেশ একদিন তাকে আঁকতে চেষ্টা করেছিল। ছবি হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে তার সমগ্র ব্যঞ্জনা ধরা পড়েনি, কোথায় যেন সামঞ্জস্যের অভাব ছিল, রেখা আছে, প্রাণ নেই। অমরেশ যখন তাকে আপন শিল্পে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছিল, তখন তার মনের সঙ্গে বহির্জগতের যোগ শিথিল হয়ে গেছে; মানুষের মনের সোণার কাঠিটি হারিয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, অমরেশেরও তাই হয়েছিল। সে তখন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বে একক হওয়ার অভিশাপ। সর্বত্র সে একা, সর্বদা সে একা। শোবার ঘরে, বৈঠকখানায়, পথে, পার্কে, বন্ধুদের মজ্‌লিসে, লর্ড্‌সে ক্রিকেট-ম্যাচে, সিনেমায়, থিয়েটারে, কন্‌সের্টে, স্যাভয়-রিট্‌স্‌-কার্ল্‌টনে, হাইড্‌-পার্কের শিকারে, পারীর পরীদের সঙ্গমে, বুল্‌ভার্‌ দেজিতালিয়াঁয়, লুভ্‌র্‌-এ, লিঙ্কন্‌স্‌ ইন্‌-এর গ্র্যাণ্ড্‌ নাইটে, যেখানেই অমরেশের অবস্থান, সেখানেই যেন সে ছাড়া আর কিছু নেই, শুধু সে, সে, সে, সর্বত্র সে। তার আমি-র গণ্ডী গায়ত্রী

মন্ত্রের মত সবিতাকে অতিক্রম করে চলে যায় ভূমা, অব্যক্ত, তৎ-কে পেছনে ফেলে অসীমকে স্পর্শ করতে। পৃথিবীটাকে তখন তার নেহাৎ ক্ষুদ্র, নগণ্য একটা গ্রহ ছাড়া আর কিছু মনে হতো না। কিন্তু সহসা যখন তার আমি বিশ্বের বৃহৎ ও বৃহত্তর পরিধি অতিক্রম করতে সুরু করতো, তখন তার মন কিসের ভয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। কিসের ভয়, অমরেশ ভালো করে বুঝতে পারতো না, সুধু কিসের অনিশ্চয়তা তাকে আতঙ্কে পঙ্গু করে ফেলতো। বৃহত্তম, শূন্য বা অসীমকে উপলব্ধি করতে যাওয়ার যে আতঙ্ক বা বিজন সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার কিংবা জুলা-পাহাড়ের ওদিককার খটে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার যে আতঙ্ক এ যেন ঠিক তা নয়, এ কতকটা মৃত্যুলোকের অনিশ্চয়তার আতঙ্ক, লন্দনের সব চেয়ে গভীর টিউব্-স্টেসনে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক। পাতায় ফুলে ভরন্ত চেষ্‌নাট্ সেদিন সুধু একটা দ্রব্য বা পদার্থের মত অপরিমিত প্রসরের মাঝখানে আপন নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটু দূরে অমরেশ তার আমিত্বের সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরের ভেতর গাছটাকে টেনে আনবার চেষ্টা করছে। ছবি হয়েছিল সুধু রেখার আঁচড় আর আয়তনের সঙ্কোচন।

আজ পাতায় ফলে ভরা সেই চেষ্‌নাট্ গাঢ় সবুজ, কচিৎ কোথাও হেমন্তের পরিণতির পীত পূর্বাভায, অমরেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-ক্লিষ্ট মনে এক অভিনব বিস্ময়ের সৃষ্টি করলে। সে মনে মনে স্থির করলে, বাড়ী ফিরেই সে তার পুরানো

ক্যান্‌ভাস্‌ আর তুলী নিয়ে বসবে। তার প্রতিবেশী এই বৃদ্ধ মহীরুহের সম্ভ্রমকে সে আবার নূতন করে রেখায় বর্ণে প্রকাশ করবে। তার বসবার ঘরের জানলা দিয়ে গাছটার যতটুকু দেখা যায়, Mrs Ramsbottom-এর বাগানের খানিকটা বেড়া, তার ওদিকে কতকগুলো গর্স আর জুনিপারের ঝাড়, একটা ঝুঁকে-পড়া উইলো আর ধূ-ধূ করা মাঠ। হ্যাম্পস্টেড্‌ হীথ নিয়ে কনস্টেবল্‌ যে-সব ছবি এঁকেছিলেন, এ তার নিঃসম্বল অনুকরণ হবে না। এতে থাকবে শুধু শতাব্দী-বৃদ্ধ বনস্পতির সম্ভ্রম। অমরেশের বৃদ্ধ প্রপিতামহের সর্বাঙ্গে এবং প্রতিটি কাজ ও কথায় যে বহু শতাব্দীর আভিজাত্য অতি সহজভাবে প্রকাশ পেত, সেই ধরণের সম্ভ্রম থাকবে গাছের প্রতিটি পাতায়, শাখা-প্রশাখায়। পেছনদিকে হবে মেঘলা রঙের আকাশ, ঘাসের ভেজা রংটি পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে হবে। বসবার ঘরের ভেতরটাও একটু দেওয়া চলতে পারে, শুধু একটা জানলা, আর দেওয়ালের বইয়ের সারির খানিকটা। হয়তো একটু রোমান্টিক হয়ে পড়বে। ক্ষতি কী? একশ বছরের পুরানো জিনিষ বলে কি আর রোমান্টিকতার দাম নেই? যে-কোনো শিল্প যেখানে কোনো রকমের সক্রিয় ব্যঞ্জনা প্রকাশ করছে, অমরেশের মতে সেই হচ্ছে শিল্প। ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, শ্রী-কুৎসিৎ অথবা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বা অনিষ্টকর, বুর্জোয়া বা কমুনিষ্ট, শিল্পের মাপ-কাঠি নয়। জীবনকে আশ্রয় করে বা অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নাম শিল্প, এই হচ্ছে শিল্প সম্বন্ধে অমরেশের

সাদা-মাটা ধারণা। এই সৃষ্টির আদিতে চাই বিস্ময়, নিতান্ত আদিম, প্রাথমিক বিস্ময়।

অমরেশ মাঠ পার হয়ে তার বাড়ীর দিকে চললো। ঢালু, উঁচু-নীচু মাঠ। নীচে নামবার সময়ে সে ছোট ইস্কুলের ছেলের মত দু-হাত ডানার মত করে মেলে ধরে ছুটে চলে। কখনো থমকে দাঁড়িয়ে হলুদ রঙের বাটার-কাপ্ আর দাঁ-দ্য-লিয়ঁ ফুলে তার দুই করপুট পূর্ণ করে। সামনে পড়ে খানিকটা উঁচু জমী, নীচে থেকে পাহাড়ের মত মনে হয়। অমরেশ গোড়ালীর ওপর ভর করে উঁচু জমী বেয়ে উঠে চলে। মনে পড়ে তার কিছুদিন আগে পড়া লণ্ডন মার্কারীর একটা কবিতার কথা। কবি সাসেক্স্-এর একটা ছোট পাহাড় বেয়ে উঠছেন। এই রকমই মেঘলা দিন, ভিজে ঘাস। পাহাড়ের ওপরে উঠে চোখে পড়ে যেন এক রূপ-কথার রাজ্য। ছবির মত ছোট্ট একখানি গ্রাম, কুটীরের আঙিনায় আঙিনায় হানী-সাক্ল্ আর ওয়াল-ফ্লাওয়ার। অমরেশ উঁচু জমীটার ওপর উঠে আসে। চোখের সামনে ঐ-ধরণেরই একটা দৃশ্য তার গোপন বিস্ময়-লোক মেলে ধরেছে। টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। অমরেশ আবার ঢালু জমী বেয়ে ছুটে চললো। ঢালুর মাঝামাঝি তার বাংলো। লাল রঙের ছাদ, তার ওপর চেষ্ট্-নাটের পাতার গাঢ় সবুজ, মাথার ওপরে মেঘলা আকাশ। আড়াইটে বেজে গেছে।

দরজায় ঘা দিতেই আন্না ছুটে এসে দোর খুলে দিলে—
So late?—Yes, Anna, I'm very sorry. Lord, I'm so

hungry, aren't you? Let's have the eats. আন্না আভেন খুলে গরম লাঞ্চ্ টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেয়। একজনের জায়গা করা হয়েছে। অমরেশের সময় নেই। সেই ছবিটা আঁকতে হবে। প্লেস্-মাছ ভাজা পরিপাটি করে, তার পাশে দু-চাকতি মিহি করে কাটা লেবু। তারপর আসে চিকেন্, তার সঙ্গে আলু আর ব্রাসেল্স্ স্প্রাউট্স্, খানিকটা সস্ আলাদা পাত্রে করে। আসে চীস্, আপেল। অমরেশ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে। আন্না হেসে শুধায়—Are you in a hurry, Mr. Ray?—No, why, Anna?—I vas only asking. লাঞ্চের পর আন্না টেবিল সাফ্ করে রান্নাঘরে চলে যায়, অমরেশ ঢোকে তার বসবার ঘরে। ঐ জানলাটা দিয়ে চেষ্নাটের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। তার ওদিকে অনেকদূর বেছানো সবুজ মাঠ। উইলোটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। অকাল-যুবতী Mrs. Ramsbottom-এর পোশাকের দু-একটা অপ্রকাশ্য অঙ্গ বেড়ার কাছে দড়ির ওপর ঝুলোচ্ছে। প্রতিবেশিনীর যৌবনের এই অপপতাকাগুলোকে বাদ দিতে হবে। অমরেশ ওপর থেকে তার আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে এসে জানলার কাছে বসলো। ক্যান্‌ভাসের ওপর পড়ে রেখার টান, আস্তে আস্তে রেখাগুলো পল্লবিত হয়ে ওঠে।

বসবার ঘরের দোর ভেজানো। তার ওপর বাইরে থেকে মৃদু আঘাত পড়লো। আন্নার কী দরকার, আলু ছাড়াতে গিয়ে আবার আঙুল কেটেছে, বোধহয়।

Yes, Anna, what do you want ?

Shall I make your bed, won't you have zome rest after lunch ?

Why ?

I vas only saying.

No, thank you, Anna, you can have the afternoon off. Go to some picture, wiil you ?

আন্নার সঙ্কুচিত পদশব্দ একটি একটি করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কলিকাতা,
১৮ই ভাদ্র, ১৩৫৮

অবকাশ

ইংলণ্ডের আকাশে-বাতাসে গ্রীষ্মের শেষ উষ্মাটুকু যতদিন টিকে থাকে ততদিন লণ্ডনী এবং লণ্ডনিনীরা প্রতি রবিবার সকালে ধারে-কাছের গ্রাম বা অন্য কোনো জনপদ অভিমুখে লাঞ্চ-বাক্স, বীয়ার-বোতল এবং পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে শ-বেঙ্ক-রথ-যোগে (char-à-banc) শহর ছেড়ে চলে যায় সারা দিনের মত। এ-ধরণের অভিযাত্রার বিবরণ ইংরেজী-সাহিত্য-যোগী ব্যক্তি মাত্রেরই পড়া আছে। সুতরাং, এবং যেহেতু এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য সাধারণ লণ্ডন-বাসীর সাপ্তাহিক গ্রামাভি-যানের বিবৃতি-বিষয়ক নয়, আমি একেবারে এই গল্পের ঘটনাস্থলে আপনাদের এনে হাজির করছি।

রবিবারের লণ্ডন সেদিন সন্ধ্যার দিকে ক্ষুব্ধচিত্তে সোমবারের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছে। এবং যে অপেক্ষাকৃত

সংখ্যা-লঘু যুবক-যুবতী শনিবার সারা রাত নেচে, রবিবার সারা দিন ঘুমিয়ে গত রাত্রের বীয়ারের অবসাদ দূর করছে, তারা সপ্তাহান্তের শেষ অবকাশ ও স্বস্তিটুকু লুটে নেবার অভিপ্রায়ে উদ্দাম উদ্যম নিয়ে পথে বেরিয়েছে। এই বিপুল জন-সমুদ্রের মাঝে সাঁড়-সাঁতার ও ডুব-সাঁতার কেটে যে-যুবকটি হন্‌হনিয়ে এগিয়ে চলেছে, তাকে দেখে বাঙালী ছাড়া অন্য কোনো জাতের বলে ভুল করা চলে না। কারণ তার মাথায় খাস্ মাদ্রিদ্ থেকে আনা কালো রঙের চওড়া বেড়-ওয়ালা ইস্পানী টুপি, কানের-পাশে সেকেলে লক্ষ্নৌ খ্যাক্সি-ক্যারেজ-ড্রাইভারদের মত গালপাট্টা, নাকের নীচে পর্তুগীজী ধরণের টিকলো গোঁফ, পরণে মুর্শিদাবাদ রেশমের হাল্কা সুট, গলার চারিপাশ ঘিরে একটা মোটা কালো ফিতে তার জামার বুক-পকেটে প্রবেশ করেছে, পায়ে পালেস্তিনী স্যাণ্ডেল, চোখে মানুষটির ভেতরকার নির্বাপিতপ্রায় প্রতিভাকে অহোরাত্র উস্কে-রাখা একটুখানি আঁচ।

একটাই যখন বলা গেল, তখন বাকীটুকুই বা বলতে আপত্তি কী? নামটা উল্লেখ না করলেও আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছেন, ইনি আমাদের অপ্রতিরথ বঙ্কু-মল্লিক। কলকাতার পথে-ঘাটে যে-লোকটিকে এক-মাথা ঢেউ-খেলানো চুল, গায়ে বিবেকানন্দী কোট, পরণে পাজামা, পায়ে কটকী চটী, চোখে মোটা মোটা কাঁটা-ওয়ালা শেলের চশমা পরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, এবং যিনি এক সময়ে ফরাসী Mont Parnasse থেকে যে-ফিকীর কবিতা-সুরধুনীকে বঙ্গ-সাহিত্যে অবতারিত

করেছিলেন, তিনিই যে এই লণ্ডন-প্রবাসী কবি জে. বি. তা খামখা বিশ্বাস করে নেওয়া কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু আবার বলি, রবিবারের সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট দিয়ে দ্রুত ধাবমান এই ব্যক্তিটি আমাদেরই সেই পুরোনো আমলের জলধিবরণ বসু-মল্লিক।

আপনারা যদি প্রশ্ন করেন, কবি জলধিবরণ লণ্ডনের এত জায়গা থাকতে অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট দিয়ে চলেছেন কেন? তার উত্তরে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা চলে যে, তিনি দশ বছর বিলেত প্রবাসের পর তিন মাস আগে নিউ স্টেট্সম্যানে একটি চার পংক্তির জাপানী ঢঙের বে-মিত্রীয় কবিতা ছাপাতে সমর্থ হয়েছেন, এবং তার পরের কবিতার জন্যে সম্প্রতি নানা ছুটকো-ছাটকা ইম্প্রেশন্ ও ইন্স্পিরেশন্ আহরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

তাছাড়া আপনাদের দেশের সঙ্গে এদেশের তফাত এই যে, এখানে ছাদের আলসেতে মেলা হলুদের ছোপ-লাগা শাড়ী, দেশলাইয়ের বাক্সের ছবি বা মাসিক-পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে ইন্স্পিরেশন্ নিতে হয় না। এদেশের ইন্স্পিরেশনরা দিন-রাত্রির পথে-ঘাটে খট্খটিয়ে হেঁটে চলে বেড়ান, এবং তাঁদের অনুধাবন-কার্যে একটু-আধটু অভিজ্ঞতা জন্মে গেলে রাতে-ভিতে পুলিসম্যানের চোখ এড়িয়ে তাঁদের বৈঠকের একেবারে খোদ-গোড়ায় এসে হাজির হওয়া যায়। তারপর গোটাকয়েক পলকা অসম্মতির পরদা সরিয়ে ফেলা শুধু ব্যক্তিবিশেষের কারসাজির উপর নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, কবি জে. বি.-র এ বিষয়ে

প্রচুর সংবাদপত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে। তা না হলে তিনি খামখা রবিবার সন্ধ্যায় এক অপরিচিত ইন্‌স্‌পিরেশনের অনুধাবন করতেন না। সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে পুণ্যাহ ভট্টারক বারের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব এই কারণে যে, যেমন আগেই বলা হয়েছে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সময় প্রায় বারো ঘণ্টা, এবং যারা শনিবার সারা রাত জেগে রবিবার সারা দিন ঘুমিয়েছে, তাদের রবিবার রাতে ঘুমোবার প্রয়োজন হয় না, এবং রাতের অবসানটুকু সোমবার কারখানা বা আপিসে আড্ডাযোড়া ভেঙে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

লন্ডনের নানা দূর পল্লী থেকে কাতারে কাতারে যুবক-যুবতী রবিবার সন্ধ্যায় যে-জায়গাটায় এসে জটলা করে সপ্তাহান্তের শেষ উন্মাদনা-টুকু নিঃশেষে উপভোগ করবার আশায়, কবি জে. বি.-র ইন্‌স্‌পিরেশন্ সেদিন অক্সফোর্ড্ স্ট্রীট দিয়ে আকাঙ্ক্ষা-বিনিন্দিত পদক্ষেপে ঠিক সেই-মুখোই ধাওয়া করছিলেন; এবং স্বয়ং কবি উক্ত রাজকন্যার পাণি-প্রার্থীর মত উঠি-কি-পড়ি অবস্থায় ভিড় ঠেলে চলেছিলেন এমনি একটা মনোভাব নিয়ে যার বাংলা পরিভাষা হচ্ছে : ঐরে, গেল, গেল, জেলে মাছটা পালিয়ে গেল!

অক্সফোর্ড্ স্ট্রীটটাকে যদি একটা নদী বলে কল্পনা করা যায়, যা বিশাল হাইড্ পার্ক রূপ সমুদ্রে এসে মিশেছে, তাহলে উপর্যুক্ত উপমার জের টেনে এও বলা যায় যে, সত্যিই জেলে-মাছ-রূপিনী মীনকন্যাটি হঠাৎ এখানে এসে বিপুল জন-সমুদ্রে অন্তর্হিত

হলো। বিফলমনোরথ কবি জলধিবরণ আপন ইন্‌স্‌পিরেশনের সহসা অন্তর্ধানে মনোরথের চাকায় ব্রেক্ কষতে কষতে দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে যেখানে এসে থামলেন সে-জায়গাটার বিবরণ আপনাদের নিশ্চই জানা আছে। মার্বল্ আর্চের ওপারে হাইড্ পার্কের যে-কোণটিতে প্রতি শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টীয় সভ্য, পাদ্রী, লেখক, সমাজ-সংস্কারক, দেশ-নায়ক ও পাগলের দল সাবানের বাক্সের মঞ্চের ওপর নিজেদের জন-সাধারণের চেয়ে হাতখানেক উঁচুতে অধিষ্ঠিত করে আপন-আপন মিশন উদ্‌যাপন করেন, এবং জনসাধারণ অন্ধকারের সুবিধা নিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ বিশেষে পরস্পরের অপরিচিত বাহুবেষ্টনীর সম্মোহনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করে আস্তে আস্তে একটি একটি জোড় বেঁধে সরে পড়ে মাঠের স্বল্পালোকিত অংশগুলোর দিকে, কবি জে. বি. এসে দাঁড়ালেন ঠিক সেই জায়গাটিতে।

এখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীযুক্ত জলধিবরণের রবিবারের সান্ধ্য অভিযানের লক্ষ্য ঠিক এই জায়গাটিই, যদিচ তাঁর ক্ষণেক আশা হয়েছিল, হাটে আসবার আগেই তিনি একটি মনের মত চাঁদকে বগলদাবা করতে সমর্থ হবেন। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর হঠাৎ চাঁদের শখ হলো কেন, এবং চাঁদ ধরলে তিনি কী করতেন, এসব কথা নিয়ে আপনারা আপোষে যা খুশী তাই আলোচনা এবং কানাঘুষো করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু সে-সব কথা আমার এই গল্পে স্থান দিয়ে এর নৈতিক উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে চাইনে। কাহিনীর উপসংহারে যে

বদান্যের পরিচয় পেয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ জলধি বাবুকে সাধুবাদ দেবেন, সেই সূত্রে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, উদীয়মান শিল্পীদের মত পথের ধারের ছোট ছোট চাকা-ওয়ালা, চলমান অশনগৃহ থেকে দেড় পেনীর পাই বা দু-পেনীর হট্‌-ডগ্‌ খেয়েই তাঁকে জীবনধারণ করতে হয়। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা তাঁর স্বচ্ছল নয়। নিজেকে মাঝে মাঝে প্রীতিকরন্ধপে আশ্চর্যান্বিত করবার উদ্দেশ্যে কঠোর দুর্দিনের জন্যে তিনি একটা-আধটা হাফ্‌-এ-ক্রাউন্‌ এমন জায়গায় হারিয়ে ফেলে স্বেচ্ছায় তার অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হন্‌ যে, নেহাৎ প্রয়োজন হলে সেটিকে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেদিন রবিবার সন্ধ্যায় জলধিবরণ তাঁর শেষ সম্বল এই হাফ্‌-এ-ক্রাউন্‌টিকে একটা ছেঁড়া অব্যবহৃত স্যুটের পকেট থেকে উদ্ধার করে পথে বেরিয়েছিলেন, কী উদ্দেশ্যে তার আভাষ পূর্বেই পাওয়া গেছে।

আপন লিপ্সিতার পদাঙ্ক-বিচ্যুত হয়ে জলধিবরণ কী স্বগত-উক্তি করলেন, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। হয়তো তাঁর ভাষাটা (স্বগত বাক্যালাপ তিনি তখনো বাংলা ভাষাতেই চালাতেন) একটু বেশী জোরালো রকমের হয়েছিল, কারণ ভাষাটা ব্যবহার করে তিনি বেশ একটু শান্তি অনুভব করলেন, এবং তিনি যে সত্যিই একজন চিন্তাশীল স্রষ্টা, এ কথাটা জনসমাজে প্রতিপন্ন করবার জন্যে পকেট থেকে আঁকানো-বাঁকানো পীটারসনী পাইপ বের করে তাতে এমন নিপুণভাবে অগ্নিসংযোগ করলেন, যে-ধরণের পোজ ভবিষ্যতে বিতরণের

জন্যে তাঁর স্মৃতিপটে বহুবার স্থান পেয়েছে। অনন্ত পাইপে গোটাকয়েক টান দিতেই তাঁর উপস্থিত কর্তব্য একেবারে সূর্যোদয়ের আকাশের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। হতচ্ছাড়া "শ্যালিকাটি"কে তিনি সেই রাত্রেই যে-কোনো উপায়ে হোক খুঁজে বের করবেন, এই মর্মে একটা সঙ্কল্পোক্তি পাইপের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর কানের কাছ দিয়ে উড়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পাইপে ঘন-ঘন টান দিতে দিতে তিনি বেশ বড়গোছের একটা ভিড়ের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। কবি কলধিবরণ মনে মনে বদ্ধপরিকর হলেন, তিনি এই রবিবারের রাতটাকে এমনভাবে অতিবাহিত করবেন যার বিবরণ শুনে তাঁর ব্লুমসবেরীর বোহেমীয় বন্ধুরা একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করবেন : J. B. ought to write a book like Céline's Voyage au bout de la nuit. অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক, ঐ রকম একখানা স্থূলকায় উপন্যাসের মালমসলা জোগাড় করবার জন্যেই কলধিবরণ উক্ত "শ্যালিকাটি" দ্বারা তাঁর রাত্রির অভিযাত্রা সুরু করবেন, এই সঙ্কল্প করে তিনি জনতার প্রান্তভাগে এসে কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ানোর পরই যে-দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো সে-কথা বললে আপনারা নিশ্চয়ই মনে করবেন, আমি গল্প বানাচ্ছি। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কলধিবরণ রোমাঞ্চিত দেহে আবিষ্কার করলেন, তাঁর কাছ থেকে হাত তিরিশ দূরে আবিষ্ট মনে বক্তৃতা শুনছেন ঠিক সেই

মীনকন্যাটি যাঁর পশ্চাৎ-সন্তরণে জলধিবরণ কিছুক্ষণ আগেই পললপর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

এ যে সেই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একটি পাৎলা রেশমের ফ্রক মেয়েটির স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল দেহটিকে এমন পরিপাটিরূপে মুড়ে রেখেছে যে, তার ঐ সূক্ষ্ম আবরণটি কতকটা বাহুল্য বলে মনে হয়। স্ত্রী-জাতির কোমর সম্বন্ধে পুরুষের কী ধারণা, আমার জানা নেই। তবে বঙ্গললনার স-ঘট কটিদেশ যখন বাঙালী পুরুষদের একটি বিশেষ আকর্ষণ-স্থল, তখন এই মেয়েটির কোমর সম্বন্ধে একটা-আধটা কথা বলা চলতে পারে। মেয়েটির কোমর আছে, এবং এমন ভাবে আছে যে, তাকে দেখামাত্রই একটি ইংরেজী চলতি কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়—Take a woman by the waist. তার শরীরের গড়নে বিধাতার এইটুকুই কারসাজি (যে-আদর্শ ভারতীয় ভাস্কর্য ব্যতীত অন্য কোথাও বাস্তবীকৃত হয়নি) যে, তিনি একে ক্ষীণ-কটিনী করলেও তার বুকের দিকে নজর রেখেছেন। ইংরেজ মেয়েদের ভাগ্যে বিধাতার এতবড় প্রসাদ খুব বেশী ঘটে না; সুতরাং মেয়েটি যদি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যৎসামান্য সচেতন হয়ে থাকে, তাকে দোষ কী? পাৎলা রেশমের ওপর তার বুকের রেখাগুলো হলোই বা আঁকা! কোমরটি ঘিরে একটা চওড়া কালো ফিতে পেছনদিকে ফাঁস দেওয়া! বাঁ হাতের কব্জীর ওপর একটা পাথর-বসানো ব্রেসলেট্ ও গলায় একগাছি সরু প্রবালের মালা, যা এ-দেশে অভাবনীয় বলে বেশী করে চোখে পড়ে। তার চোখ,

মুখ, নাক, ঠোঁট, দাঁত প্রভৃতির বিশদ বিবরণ যদি আপনারা পেতে চান তো vide J. B.'s Anatomy of Inspiration, ছোট কবিতার বই, পাতা কুড়ি, দাম বেশী নয়, শিলিংখানেক। সুতরাং সে-সবের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

আপাততঃ জলধিবরণের সমস্যা হলো, কী উপায়ে তিনি উক্ত মীনকন্যাটির সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে হাত তিরিশ দূরে তাঁর ঈপ্সিতার কাছে গিয়ে পৌঁছতে হলে যেটুকু কোমুইয়ের কারসাজির দরকার হতো তা জলধিবরণের মত ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর মত মার্জিতরুচি লোকের পক্ষে কিউ-প্রথা প্রচলিত না হলে হয়তো জীবনে কোনোদিন থিয়েটার-সিনেমা বা লর্ড্‌সে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা হয়ে উঠতো না। এবং এসব কাজে সব চেয়ে বড় অন্তরায় তাঁর বিস্তৃত-সীম ইস্পানী টুপী, ও দীর্ঘাকৃতি পাইপ, যে-দুটিকে বাদ দিলে তাঁর সত্তার অনেকখানি বাকী থেকে যায়, এবং যে-দুটোকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বোক্ত কবি জে. বি.-র যত্রতত্র গতায়াত সম্ভবপর নয়। জলধিবরণ গত্যন্তর না দেখে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বক্তৃতা শোনবার ভান করে ঠিক সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন যেখানে হাল্‌কা কোয়াসা-মাখা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় প্যাংলা রেশমের ওপর আঁকাবাঁকা রেখাগুলো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

দু-পাশে রেলিং-দেওয়া একটা কাঠের সিঁড়ির ওপরে গজ-খানেক পরিসরের একটু চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে লম্বা কালো আলখাল্লা পরা প্রায়বৃদ্ধ একটি লোক ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা

দিচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে একটা কালো কাঠের ওপর বড় বড় শাদা অক্ষরে লেখা—Save the white Niggers. ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের ওপরেই নাকি ঐ একই আকারের একটি নিগারল্যাণ্ড্ বিদ্যমান, বক্তা এই কথাটাই নানা উপায়ে শ্রোতাদের মগজের ভেতর প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছেন্। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শোনার পরই উপলব্ধি করা যায়, এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বিলেতের কর্মহীন মজুরদের সাহায্য করা। একটু পরে হঠাৎ কথকের সঙ্কেতে একদল লোক পোয়াবাজি বাজিয়ে জনতাকে সঙ্গীতে আহ্বান করলে—Oh, Save the white Niggers.

জলধিবরণ এই ধরণের কোনো একটা অঘটন ঘটবার অপেক্ষায় ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমগ্র জনতা সঙ্কীর্তনে আবিষ্ট হলো:

Oh, Save the white Niggers.

Give the poor beggars ইত্যাদি।

কথার সুরে বাঁধা আকৃষ্ট কথাগুলো দেখতে দেখতে তাদের ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে সুরু করলে। এবং সবাই পা ঠুকে, হাততালি দিয়ে, গা-ঝাড়া দিয়ে, মাথা নেড়ে গাইতে গাইতে একেবারে মেতে উঠলো। শ্বেতাঙ্গ কাফ্রীদের উদ্ধার করবার জন্যে যখন তাদেরই সমবেদনা-ব্যথিত নরনারী ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন, যা অনুমান করা যেতে পারে, একটি একটি ছেলে একটি একটি মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে সভা ছেড়ে সার্পেন্টাইনের

ধাপে ধাপে বনবাদাড় অভিমুখে ধাবিত হলো। কারণ শনিবারের রাতের পর রবিবারের দিবানিদ্রায় তাদের যৌবনে যে মন্দা পড়ে আসছিল, তা হাওয়ায় ঝাঁকুনিতে একেবারে পেকে উঠলো। জলধিবরণ কতকটা কথার তালে তালে সরে সরে এসে হাজির হলেন এমন জায়গাটিতে যেখানে আসবার জন্যে তিনি গত আধ ঘণ্টা যাবৎ প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মীনকন্যা ও তাঁর মাঝখানে যেটুকু ব্যবধান, তাতে পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নেদিষ্ঠ ভবিষ্যতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি প্ল্যান ছকে নেবার সময় পেলেন।

আধময়লা চাঁদের আলোয় তেরছা-করে বসানো কমলা-রঙের টুপীর নীচে ঝুমকো ঝুমকো সোনালী চুল আর প্রবালের মালাটির যে সমন্বয় সেদিন জে. বি.-র চোখে ধরা দিয়েছিল, তারই কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর Anatomy of Inspiration-এর A posteriori-শীর্ষক কবিতা-চক্রে। প্রেমিকের প্রশ্বাসের মত গ্রীষ্মশেষের দু-এক ঝলক বেপথু, মন্দ বায়ু মেয়েটির মসৃণ গ্রীবায় তার সোনালী চুলগুলোকে কীভাবে থেকে থেকে স্থানচ্যুত করছিল, সে-দৃশ্য জলধিবরণ সেদিন অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করেছিলেন, এবং তাতেই ছিল তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রধান প্রেরণা। তিনি ঐ প্রেরণাটিকে আরো অধিক মূর্তরূপে পাবার জন্যে আস্তে আস্তে মেয়েটির খুব কাছে সরে এলেন। এত কাছে যে তাঁকে মুখ থেকে পীটারসনী পাইপটি নামাতে হলো, নচেৎ তার আগুনে মেয়েটির চূর্ণকুন্তলের কয়েক-গাছি পুড়ে ছাই হতো।

একক্ষণ পরে হাইড্-পার্কের মলয়-পবন যে-কাজে ব্যাপৃত ছিল, জলধিবরণ ঠিক সেই কাজটিরই ভার পেলেন। অর্থাৎ তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মীনকন্যাটির কুন্তল-গুচ্ছ মুহুর্মুহু স্থানচ্যুত হতে লাগলো, এবং সেও বারে বারে হাত দিয়ে তার পেছনদিককার চুলগুলোকে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। বারংবার এমত ঘটনা ঘটায় জলধিবরণকে বাধ্য হয়ে একবার বলতে হলো—Oh, pardon. মেয়েটিও তার পাখারের মত নাথলীল গ্রীবা হেলিয়ে পেছন ফিরে উত্তর দিলে—Oh, it's all right. কবি জে. বি.-র সঙ্গে তাঁর ইন্‌স্পিরেশনের এই প্রথম চোখোচোখি হলো, এবং ভিড়ের প্রসাদে তাঁদের মুখ বক্তমত কাছাকাছি এসে পড়লো। ক্রমে পেছনের লোকের অগ্রগতিতে তিনি মীনকন্যাটির একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এইখানেই যদি তিনি সাধারণ বাঙালী কবির মত দু-চোখ ভরে তার রূপ-সুধা পান করে, তার স্পর্শ-সুখ অঙ্গে বহন করে কণ্টকিত দেহে তাঁর ক্লাবে ফিরে আসতেন, তাহলে বাংলাভাষায় একখানা মহাকাব্য-জন্মলাভ করতে পারতো। কিন্তু যেহেতু তিনি Celine-এর "রাত্রি-পারের যাত্রা"-র মত একখানা উদ্ভ্রান্ত-প্রেমালিত মহাভারতের মালমশলা সংগ্রহ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁকে বাধ্য হয়ে বেশ একটু অসমসাহসিকতা করতে হলো। এবং বিধির বিধানে এইখানেই কিশোরী রাত্রিতেই তাঁর নৈশ অভিযানের উপসংহার ঘটলো।

জলধিবরণ এই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটির অত কাছে দাঁড়িয়ে

বেশীক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলেন না। মিনিট পাঁচেক উস্-খুস্ করে এবং বার তিনেক "Oh pardon" বলে অবশেষে তিনি বেপরোয়াভাবে তাঁর ডান হাতটিকে আস্তে আস্তে মেয়েটির বাঁ হাতের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন। শীতধাতের সঙ্গে এ-কাজটি বেশ ক্ষিপ্র গতিতেই সম্পন্ন হলো। এবং তিনি যেরূপ আশা করেছিলেন, মীনকন্যাটি পেছন ফিরে তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকে হাসলে। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল, জলধিবরণের প্রেরণাটি ভিড়ের ভেতর থেকে তার ডান হাতটিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। সুতরাং তিনি নিজে একটু সরে গিয়ে তাকে তাঁর দিকে একেবারে মুখোমুখিভাবে ফিরে দাঁড়াবার সুযোগ দিলেন। অর্থাৎ এইবার তাঁরা দুটিতে আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে বাইরে আসবেন। এইখানেই জে. বি.-র আশায় ছাই পড়লো। তাঁর দিকে ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি তাঁর সামনে একটি কালোরঙের তালা-দেওয়া টিনের গোল বাক্স তুলে ধরে একটা ঝাঁকানি দিলে। তার ভেতরে যে নানা আকারের অর্থ-খণ্ড জমা হয়েছে, তা ঝাঁকানির শব্দেই স্পষ্ট বোঝা গেল। এবং বাক্সটির ওপর জলজলে শাদা অক্ষরে লেখা "Save the white Niggers" মীনকন্যার এমত আশঙ্কাতীত ব্যবহারের তাৎপর্য জলধিবরণকে এক নিমেষেই বুঝিয়ে দিলে।

জলধিবরণ যন্ত্রচালিতবৎ তাঁর পকেটে তাঁর শেষ-সম্বল হাফ্-এ-ক্রাউনটির খাঁজ-কাটা ধারে দু-একবার আঙুল বুলিয়ে সেটিকে বাক্সের ওপর লম্বা সরু গর্তটির ভেতর দিয়ে গলিয়ে

দিলেন। ঝনাৎ করে একটা নীরেট শব্দ হলো। এবং শ্বেতাঙ্গ কার্ত্তীদের সাহায্যকল্পে এক বিখ্যাত বাঙ্গালী লেখকের ইংরেজী ভাষায় লেখা "যাত্রিপাদের যাত্রা"র-পূর্ণচ্ছেদ পড়লো।

কলিকাতা,
২০শে কার্তিক, ১৩৪৮

লেস ও রেশম

সেদিন রবিবার। কিন্তু শর্বরীভূষণকে কোনো বিশেষ কারণে ব্রাহ্ম মুহূর্তেই শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরতে হয়েছিল। এবং সে যেমন আশা করেছিল, বেল্‌সাইজ্‌ পার্ক্‌ থেকে উইম্‌বল্‌ডন্‌-এ গিয়ে সকাল আটটার মধ্যেই, অর্থাৎ তার ল্যাণ্ড্‌লেডী উঠে গির্জেয় কমিউনিয়ন্‌-এ যাবার আগেই বাড়ী ফিরতে সমর্থ হবে, তা হয়ে উঠলো না। পথে আসতে আসতেই সে শুনতে পেলে, দূরের পুরোনো গির্জের ঘড়িটা কেন হাই তুলে আড়া-মোড়া ভাঙতে ভাঙতে একটি একটি করে নটা বাজিয়ে দিলে। যত্ত্‌ যদি বাহাদুরী করে চা আর সসেজ না করতে যেত, তা হলে এতটা দেরী হতো না। মিসেস্‌ কটিং-এর কাছে তাকে দস্তুরমত অপদস্থ হতে হয়েছে, একথা শুনলে সে শুধু হাসবে বৈ ত নয়। তার ল্যাণ্ড্‌লেডী যে আর মাসী-পিসী নয়, সেকথা না জানে কে?

কিন্তু মচ্‌ একথা একেবারেই বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, ইংরেজ ছাত্রদের যে-ব্যবহারকে সাধারণতঃ ল্যাণ্ডলেডীরা sowing wild oats বলে মুচকী হাসিতে উড়িয়ে দেয়, ভারতীয় ছাত্রদের বেলায় সে-ব্যবহারকে তারা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করে থাকে। এবং মিসেস কীটিং-এর জিহ্বা এবিষয়ে তাঁর স্বগোত্রীয়-উদ্ভাবিত vermin powder-এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কোনোপ্রকার দুর্নীতিকে তিনি যে vermin-এর মত মনে করেন, তা নিয়ে যখন-তখন নিজের উদ্বাহ-লব্ধ নামটির প্রতি ইঙ্গিত করা তাঁর রেওয়াজ।

শর্বরীভূষণ যখন ত্রস্তপদে আপন ঘরে এসে ঢুকলো তার আগেই মিসেস্ কীটিং তার জিনিষপত্র ঝাড়াঝোছা প্রায় শেষ করে এনেছেন। তার দিকে না তাকিয়েই তিনি একটু যেন শ্লেষের সুরে বললেন—An early bird, eh? শর্বরীভূষণ একটা চলনসই গোছের গুড্‌মর্ণিং বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ পড়লো জানলার ধারে নিজের বিছানার ওপর। পরিপাটিরূপে আইডারডাউনটি গোছানো, তার ওপর বেড-কভারটি নিখুঁতভাবে ঢাকা দেওয়া, এবং তার ওপরে! শর্বরীভূষণ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হলো। সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে, না সত্যি? মচের ছেলেমানুষী ও স্বেচ্ছাচারিতায় তার মন বিষিয়ে উঠলো। নীল ফুলকাটা বেড্‌-কভারটার ওপর একটু বেশী করে চোখে পড়ে এমনভাবে মেলে রাখা ঐ জিনিষটা। ক্রীম রঙের রেশমী কাপড়, তার ধারে ধারে লেস বসানো।

অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করেই কাগজটা চাপা দেবার অভিপ্রায়ে শর্বরীভূষণ তাড়াতাড়ি তার হ্যাট ও কোট সমেত তার ওপর বসে পড়লো।

মিসেস্ কীটিং আগুনের ধারের পেতলের ফেণ্ডারগুলোকে মেট্যাল-পলিশ্ দিয়ে ঘসে ঘসে চক্চকে করতে লাগলেন, এবং শর্বরীভূষণ বসে বসে ভাবতে লাগলো, কী ভাবে কোনো একটা আলোচনা শুরু করা চলতে পারে। গতকালের চেল্সীর ফুটবল ম্যাচ, আর্চ্‌বিশপ্ অফ্ ক্যান্টারবারীর হাইকিং সম্বন্ধে মতামত, বিশপ্ অফ্ লাণ্ডনের খ্রীষ্টধর্ম ও শান্তি-সমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতা, সেণ্ট্ পলের ডীন্-এর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান, কুইন্স্-হলে এক মিডিয়ম কর্তৃক পরলোকের সচিত্র বিবরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি, যা সে সেদিন ট্রেনে রবিবারের ছবিওয়ালা কাগজগুলোয় পড়তে পড়তে আসছিল, তাদের সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গেই মিসেস্ কীটিং-এর বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই নিতান্ত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—Hm-hm, is that so? বিশেষ কোনো কারণে তিনি যে শর্বরীভূষণের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, তা তাঁর অস্বাভাবিক তুষ্ণীম্ভাবের চেয়ে অকাট্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। শর্বরীভূষণের মনে এই সন্দেহ যতই প্রকটতর হয়ে উঠতে লাগলো ততই তার নিজের বাক্পটুতার ওপর আস্থা কমে আসতে লাগলো, এবং তার পরিষ্কার অক্স্ফোর্ডী ইংরেজী ক্রমে কার্ট বুকের কোথায় গিয়ে ঠেকলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস কীটিং বেশ একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্বগতোক্তি করলেন—Ah well, another Sunday coure. শর্বরীভূষণের মনে হলো, কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে। তার শনিবারের রাতগুলোর প্রতি ঠেস দিয়েই যেন রবিবারের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হলো। একটু মন-রাখা শুকনো হাসি হেসে সে প্রস্তাব করলে, আজ সন্ধ্যায় মিসেস্ কীটিংকে নিয়ে সে সিনেমায় যেতে চায়। অন্য-অন্য বারের মত এবার সিনেমা যাওয়া সম্বন্ধে মিসেস্ কীটিং-এর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। পবিত্র রবিবারে যে তিনি কোনোরূপ আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন না, একথা শর্বরীভূষণের জানা থাকলেও তার মনে হলো, তিনি শুধু Lord's day-র ছুতো করে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। একটু অপ্রতিভ হয়ে শর্বরীভূষণ যে নূতন প্রস্তাব করলে, তা তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য। সে কি মিসেস্ কীটিংএর সঙ্গে এপারেটার সার্ভিসে গির্জেয় যেতে পারে? এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবেও তাঁর কোনো উৎসাহ প্রকাশ পেল না। নিতান্ত সাধারণভাবে উত্তর এলো, ডিনারের জোগাড় করা হয়নি এখনো, আজ গির্জেয় যাবার সময় নেই। তিনি যে শর্বরীভূষণের ওপর রীতিমত চটেছেন, এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আর কী হতে পারে! অনেক চেষ্টা করেও সে তার মুখের ওপর হাসির শেষ রেশটুকু জাগিয়ে রাখতে পারলে না। সামনের দেওয়াল-আয়নায় দেখতে পেলে, তার কানদুটো কসমেটার মত রাঙা হয়ে উঠেছে, এবং

অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ার কতকগুলো এলোমেলো, অসংযত রেখায় তার মুখখানাকে নিতান্ত করুণ করে তুলেছে।

তথাচ শর্বরীভূষণ দমবার পাত্র নয়। সে এবার এমন এক প্রস্তাব করলে যা সে স্বদেশে দু-একবার ছাড়া কখনো কার্যে পরিণত করেনি। মিসেস্ কীটিং-এর সঙ্গে সে বাজারে যেতে পারে কী? বৃদ্ধা বাজারে যাবার সময়ে তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোনকে সঙ্গে নেবার জন্যে প্রায়ই সাধাসাধি করেন, সে তা লক্ষ্য করেছে। গত শুক্রবার বোনটিও ব্রাইটনে উইক্-এণ্ড্ কাটাতে গেছে। সুতরাং শর্বরীভূষণের ক্ষীণ আশা হলো, তার সঙ্গ এমন অযাচিত-ভাবে লাভ করতে পারলে নিশ্চয়ই তা প্রত্যাখান করা মিসেস্ কীটিং-এর পক্ষে সম্ভব নয়। বাজার আর কী? কিছু আনাজ-তরকারী আর মাংস, বড়জোর গ্রোসারের দোকান থেকে চিনিটা, ময়দাটা বা এক প্যাকেট "সুয়েট্," চামড়ার ব্যাগটায় বিশেষ অশোভন দেখায় না, তাছাড়া মিনিট পাঁচেকের পথ। কেই বা লক্ষ্য করছে? কিন্তু তার এ আশাতেও ছাই পড়লো। উত্তর এলো, আর বাজারে যেতে হবে না, আজকের বাজার কালই করা হয়েছে। আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে শুধু "Ah well" বলে শর্বরীভূষণ চুপ করে রইলো।

মিসেস্ কীটিং আপন মনে কার্পেট-ক্লীনার দিয়ে ঘরের গালচে-খানাকে ঘাস কাটার মত ঘুরে ফিরে পরিষ্কার করতে লাগলেন। প্রতি রবিবারেই যখন তাঁর সঙ্গে শর্বরীভূষণের দেখা হয়, তখন তাঁর নানা অবান্তর প্রসঙ্গে বেচারাকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়।

অথচ আজ সে এতবার চেষ্টা করেও তাঁর মুখ থেকে এক সঙ্গে দুটোর বেশী কথা বার করতে পারলে না। এ মৌনব্রতের কারণ কি তার জানতে বাকী আছে? প্রতি শনিবারই যখন এতদিন ধরে উইম্বল্ডনে কাটিয়ে এসেছে, তখন এ শনিবারটাই বা সে তার ক্লাস্‌-এ কাটাতে গেল কেন? মতের ঝোঁক! একবার যা তার মাথায় ঢুকবে, তা কাজে না করে সে কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের সম্পর্ক যদি সে নিজের মা, ভাই-বোনের কাছেই গোপন না করে থাকে তো কোথাকার কে এক শুখনো বুড়ী ল্যাণ্ড্‌লেডীর কাছে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করতে যাবে কেন? ওরকম করলে নাকি তাদের দু-জনকেই কঠিন মানসিক রোগে ভুগতে হবে; একবার মানুষের মনটা দু-টুকরো হয়ে গেলে তাকে জোড়া দেওয়া নাকি all the king's men and horses-এর সাধ্য নয়। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে সে নীচ, ঘৃণ্য মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে রাজী নয়। কিন্তু তাই বলে অমন অশ্লীল হবার কী প্রয়োজন ছিল? তাদের কথা যারা জানে, তাদের কাছ থেকে লুকোবার পক্ষপাতী সেও নয়। কিন্তু সবার কাছে অমন ঢাক পিটিয়ে বেড়াবার দরকার কী? বিশেষতঃ বীতপ্রাণ মিসেস্ কীটিং-এর বাড়ীতে রাত কাটিয়ে গিয়ে যে বাহাদুরী করে গেল, তার ওপর বাড়তি ওটুকু কি না করলেই চলতো না? শর্বরীভূষণ মনে মনে ঠিক করলে, আজই বিকেলে মন্তুর সঙ্গে এধরনের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নেবে।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ বসে থেকে অস্বাভাবিক নীরবতায়

শর্বরীভূষণ অস্থির হয়ে উঠলো। সে বেশ বুঝতে পারলে, আজ সারাদিন এইভাবে কাটবে। কাল সকালে তার টেবিলের ওপর খামে-ভরা চিঠিতে সে জানতে পারবে, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে দু-একবার এরকম ঘটনা সে আগেই প্রত্যক্ষ করেছে। লণ্ডনে মনের মত বাড়ী খুঁজে পাওয়া একরকম অসম্ভব। ভারতীয় দেখলেই ল্যাণ্ড্লেডীরা নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। মিসেস্ কীটিং-এর আর যাই দোষ থাক ওসব প্রাণিচার নেই। এমন কি দু-একজন দুস্থ ভারতীয় ছাত্রকে তিনি মাসের পর মাস বিনা খরচে নিজের বাড়ীতে রেখেছেন। একটা কেলেঙ্কারী করে তাঁর বাড়ী ছাড়তে হলে লজ্জায় সে মরে যাবে। মন্টের বেহায়াপনায় সে ভারী বিরক্তি বোধ করতে লাগলো। ঐ অসভ্যতাকাটিকে না রেখে গেলে এমন কি তার হানি হতো?

খানিকক্ষণ ভেবে শর্বরীভূষণ আর এক প্রস্তাব করলে। এটি তার হাতের রঙের তুরুপ্। এটিও যদি কার্যকর না হতে পারে তাহলে কাল থেকেই একটা বাড়ীর খোঁজে বেরুতে হবে। কথাটা কীভাবে তোলা যায়, সেও একটা সমস্যার মধ্যে। মিসেস্ কীটিং-এর অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাঁর দুর্বোধ্য মনোভাব তার জানা আছে। তাঁর যে টাকার প্রয়োজন, এরকম অনুমান তিনি ব্যক্তিগত অপমান বলেই মনে করে থাকেন। কথাটা একটু ঘুরিয়ে সে বললে—ওহো, মিসেস্

কীটিং, আমার এক ভারী মুস্কিল হয়েছে। জানেন, ফরাসীরা যাকে বলে embarras de richesse, ঠিক তাই। কাল সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি, বাবা অনেকগুলো টাকা পাঠিয়েছেন। জানেনই তো আমি যেরকম খরচে মানুষ। তাই ভাবছিলাম, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তো সামনের চার সপ্তাহের টাকাটা আগাম দিয়ে রাখি। কী বলেন ?—মিসেস্ কীটিং উক্ত প্রস্তাবে যে বিশেষ উদ্বেল হলেন তা নয়। তবে আগাম নিতে তার আপত্তি নেই, জানালেন। শর্বরীভূষণ আশ্বস্ত হলো, বুড়ী তার ওপর নিতান্ত বিরূপ হলেও তাকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে না। হয়তো বুড়ী নিজেই আড়ালে তাকে জানিয়ে দেবেন, তাঁর বাড়ীতে এসব অনাচার ভবিষ্যতে যেন না ঘটে। তার পর ক্রমে কথাটা চাপা পড়ে যাবে। এবং এর মধ্যে ধীরে সুস্থে একটা অন্য বাড়ী খুঁজে নিলেই চলবে। টাকায় কী না করতে পারে ? দেখ না, এতক্ষণ পরে বুড়ীর মুখ থেকে হেসো নামলো ! যাক্, এযাত্রা বাঁচা গেল।

শর্বরীভূষণের ব্যাঙ্কে পনেরো পাউণ্ড আলাদা করা ছিল, সামনের সপ্তাহে মঞ্জের সঙ্গে পারীধামে উইক্-এণ্ড্ করতে যাবে বলে। বাড়ীর টাকা আসবার এখনো দেরী। পারী-যাত্রাটা দু-এক সপ্তাহ পেছিয়ে না দিয়ে উপায় কী ? মঞ্জ্ রাগ করবে। তার কাছে অসুস্থতার ছুতো করলেই চলবে। শরীরটা তার ভালো নেই, ব্যস্ ! মঞ্জের সঙ্গে পারীর অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো, তার পর কার্তিয়ে লার্তাঁয় একটা পুরোনো রোমান্টিক

হোটেলে রাত জেগে তারা দু-জনে ভিয়ঁ-র গ্রাঁ তেস্তামাঁ পড়বে, সেই পুরোনোকালের মেয়েদের বর্ণনার জন্য। গ্রাঁ তেস্তামাঁ! কতদিন ধরে তারা এমন দুটো রাতের স্বপ্ন দেখে এসেছে। কালই তারা চেয়ারিং ক্রসের পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে ভিয়ঁ-র একখানা বই কিনে এনেছে। শর্বরীভূষণ তখনই পড়তে যাচ্ছিল, মড্ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—No darling, not until we find the very place where Villon used to make love to his ladies. শর্বরীভূষণ প্রসন্ন মনে বুক পকেট থেকে চেক-বই বার করে মিসেস্ কীটিং-এর নামে সাড়ে দশ গিনীর একখানা চেক্ লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করলেন।

কোমরের এপ্রনে হাত মুছে মিসেস্ কীটিং চেকখানা দুটো আঙুল দিয়ে ধরে তাঁর ব্যাগে রেখে দিলেন। শর্বরীভূষণ লক্ষ্য করলে, চেকখানা হাতে পেয়ে তাঁর মুখের জমোট ভাবটা একেবারে কেটে গেছে। কী বস্তুবাদী এরা! ধর্ম, নৈতিকতা শোভন-অশোভন যা কিছু সব টাকায় ওজন-করা। যাই হোক্, বেচারী বুড়ীর নেহাৎ টাকার দরকার পড়েছিল, মুদীর দোকানে অনেক বাকী পড়েছে নিশ্চয়। তা না হলে শুধু টাকা আগাম নিয়ে এতবড় একটা দুর্নৈতিক ব্যাপারকে মার্জনা করতে পারে? মুখে কিছু বললো না। কিন্তু বিছানার ওপর লেস-ওয়ালা রেশমের কাপড়টাকে যেভাবে ছড়িয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল, তাতে সেই কাপড়টাই তো চিৎকার করে ল্যাণ্ড্-লেডীর

মনের কথাটা তাকে জানিয়ে দিয়েছে। যাক্, এযাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল।

মিসেস্ কীটিং ঘর সাফ করে তাঁর কার্পেট-ক্লীনারটা একপাশে সরিয়ে রেখে কী একটা জিনিষ খুঁজতে লাগলেন। টেবিল, আলমারী, সোফা, কোথাও নেই সেটা। তন্ন-তন্ন করে দু-বার খুঁজলেন। তারপর শর্বরীভূষণের কাছে এসে বললেন—Do you mind getting up a little ?

কেন, কী হয়েছে ?

এই যে বিছানার ওপরেই ছিল সেটা !

শর্বরীভূষণ "কী" জিজ্ঞেস করবার আগেই মিসেস্ কীটিং তার ওভার-কোটের তলায় একপাশ থেকে বেরিয়ে-থাকা একটুকরো লেস ধরে বললেন—এই যে, আপনি দিব্যি চেপে বসে পড়েছেন তার ওপর, please get up.

এখন আর না উঠে উপায় কী ? শর্বরীভূষণ কান দুটো রাঙা করে উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস্ কীটিং-এর সগোত্রীয়-উদ্ভাবিত vermin powder প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সার্মন শোনবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হলো।

মিসেস্ কীটিং লেস-দেওয়া রেশমের কাপড়টা বিছানার ওপর থেকে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে আশাতীত স্বগতোক্তি করলেন—ইস্তিরিটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর সেটাকে নিয়ে সটান্ জানলার কাছে গিয়ে দু-পাশের হুকের ওপর ঝুলিয়ে দিলেন।

বুকে হাত চেপে বিছানার ওপর বসে পড়ে শর্বরীভূষণ আবিষ্কার করলে, ওটা মিসেস্ কীটিং-এর সংসারে সস্তা-কেনা হাল-ফ্যাশানের বাহারে পর্দা ছাড়া আর কিছু নয়।

কলিকাতা,
৬ষ্ঠী অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

প্রথম প্রেম

একদিন অম্বিকাচরণের বাড়ী এসে তার বন্ধু রমেন ঘোষ খবর দিলে, লন্ডনে নাকি বত্রিশ শিলিং-এ তোফা স্যুট পাওয়া যায়, তার ওপর আরো পাঁচ শিলিং খরচ করলে মেলে এক জোড়া গ্লাভ্‌-ফার্‌।

যাঃ, বাজে চাল মারিস্‌নি।

মাইরী, আমার এই ডান্‌হিলের আগুন ছুঁয়ে বলছি।

বেশ, করিয়ে নিয়ে দেখাস্‌।

আজ মাপ দিতে যাবো ভাবছি, চল্‌ না আমার সঙ্গে।

সামনে একজামিন, হাতে পয়সা নেই, তুই একাই যা।

যাবি আর আসবি, বিকেলের দিকে বেরুনো যাবে। এখান থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা, বাসে চড়ে মাথায় খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে আসবি। স্যুট না হয় নাই করালি, শুধু বেড়িয়ে আসবি।

এর ওপর হরেন দোকানের একটি মেয়ের এমন বর্ণনা দিলো যে, পরীক্ষা-ক্লিষ্ট, কর্ম-নির্বাসী অম্বিকাচরণের পক্ষে কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠলো।

হ্যাম্পস্টেড্ থেকে টিউবে করে টটেনম্‌কর্ট্ রোডে এসে তার পর দোতালা বাসে চড়ে শেফার্ডস্ বুশ্-এ দুই বন্ধুতে গিয়ে নামলো। তারপর একজায়গায় এসে হরেন একটু দূরে একটা দোকানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—এবার বিশ্বাস হচ্ছে, Three piece Suit for 32/-, 5/- extra for plus-fours? ফার্ষ্ট্ ক্লাস কাপড়। পশ্ পাড়াতে হলে ওর দাম অন্ততঃ চার গিনী নিত।

বলতে বলতে তারা দোকানের ভেতর ঢুকলো।

দোরের কাছে একজন কাঁচা-পাকা চুল-ওয়ালা লোক ওয়েস্ট-কোট্ গায়ে দিয়ে গলায় গজ-ফিতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করছিল। ওদের অমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি দাঁত-খোঁটা শলকটাকে পকেটে রেখে বেশ একটু আড়ম্বর করে অভিবাদন জানালে।

দোকানে ঢুকে অম্বিকাচরণ যে-রকম আশা করছিল তার চেয়ে ঢের-বেশী চমৎকৃত হলো। দূরটি অন্ধকার কোণে কাচ দিয়ে ঘেরা একটা কাঠের ডেস্কের ওপর বসে কী একখানা খাতা লিখছে মেয়েটি। মাথায় একরাশ সোনালী চুল পেছন দিকে খোঁপা করে বাঁধা, একটু লম্বা ধরণের মুখ, ঠোঁটের কোরক-দুটি অভিমানে ভরা। অম্বিকাচরণকে সব চেয়ে আকর্ষণ করলো তার

গাঢ় নীল চোখ এবং একটু ওপর দিকে তোলা, বলবেন্ যেন্ শিশু হরিণের চোখের পাতা। রমেন বোস যতক্ষণ দোকানের মালিককে নানা কাপড় দেখানোতে ব্যস্ত রাখলে ততক্ষণ অম্বিকাচরণ মেয়েটির রূপ দু-চোখ ভরে দেখেও তৃপ্ত হতে পারলে না।

খানিকক্ষণ এটা ওটা সেটা দেখার পর রমেন বোস হাল্কা ব্রাউন রঙের একটা কাপড় পছন্দ করে অম্বিকাচরণকে তার মতামত জিজ্ঞেস করলে। সামনেই সামার আসছে, এ শেডটা ভালোই হবে, না? অম্বিকাচরণ অনুমোদন করবার আগেই ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটি কলের মত আউড়ে গেল—The very shade you want, Sir, you'll find it extremely pleasant when the Sun begins to show itself more regularly. What d'you say Miss, eh? শেষ প্রশ্নটা কেন যে মেয়েটিকে করা হলো তার সম্যক্ তাৎপর্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হলেও রমেন ও অম্বিকাচরণ দু-জনেই পুষ্ট ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরালে। মেয়েটি শুধু "I should think so" বলে চুপ করে রইলো। ভারী লাজুক মেয়েটি, হয়তো ভদ্রঘরের, দারিদ্র্যের পীড়নে এই গরীব পাড়ায় এসে, শস্তা দর্জির দোকানে খাতা লেখবার কাজ করছে। অম্বিকাচরণ তার জন্যে মনে মনে কেমন একটু সমবেদনা অনুভব করলে।

ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটি হাতের কাপড়টা কাউন্টারের ওপর মেলে দেখে গলার গজ-ফিতেটার এক দিক ধরে টান দিতেই

সেটা সাপের মত এঁকেবেঁকে মাটিতে এসে পড়লো। তারপর মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বললে—Take down the measurements, will you please, Miss? ছাতি এত ইঞ্চি, কোমর, গলা, একে একে জ্যাকেটের সব মাপগুলো লেখা হলো। এবার পেন্ট্‌লেন। বেড় এত ইঞ্চি, পাছা এত ইঞ্চি, চওড়া এত ইঞ্চি, লম্বা এত ইঞ্চি, দর্জি রমেনের উরুমূল থেকে পায়ের গোড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত গজ-ফিতেটা টেনে ধরলে। এতক্ষণ মেয়েটি মাপ নেওয়া দেখছিল, এইবার যেন একটু সলজ্জভাবে খাতার ওপর তার ঐ ডাগর ডাগর চোখ দুটোকে নামিয়ে নিলে। এইবার প্লাস্-ফর্স্। দর্জি রমেনকে তার পেন্ট্‌লেনটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরতে অনুরোধ করলে। সিল্কের মোজা আর সাস্পেণ্ডারের মাঝখানে রমেনের অনাবৃত পায়ের খানিকটা দেখা গেল। অম্বিকাচরণ লক্ষ্য করলে, মেয়েটির চোখ আগের মতই খাতার ওপরে, লজ্জায় সে যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

এর পর কিছু আগাম টাকা দিয়ে রমেন ও অম্বিকাচরণ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, এবং ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটা আবার দোরের কাছে দাঁড়িয়ে কলমের মত করে কাটা একটা পালক দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

দোতলা বাসের মাথায় বসে অম্বিকাচরণের মনে হলো তার চোখে সমস্ত লন্ডন শহরটা আগাগোড়া বদলে গেছে। এপ্রিলের পড়ন্ত রোদ মাখা গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি কেন্‌সিংটন্ গার্ডেনস্-এর নব-জাগরিত পত্রপল্লবের ওপর মুঠো মুঠো সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

রমেন বোস তার হাতটা একটু টিপে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলি, চলনসই ? আমার কোনো ইণ্টারেস্ট্ নেই, এখন it's up to you.—অম্বিকাচরণ শুধু উত্তর দিলে—I feel rather sorry for her slaving for that despicable Jew. যা থেকে রমেন বোস অনুমান করলে, অম্বিকাচরণ সত্যিই প্রেমে পড়েছে।

এবং অম্বিকাচরণ যথার্থই প্রেমে পড়লো।

বাসায় ফিরে চাঁওয়ার অছিলায় সে তার ল্যাণ্ডলেডীকে তার ঘরে আগুন জ্বালাতে বললে, এবং ড্রেসিং-গাউন পরে Pre-Raphaelite-দের কবিতার বই নিয়ে বসলো আগুনের ধারে। Harris-এর Criminal Law আর Morgan-এর Constitutional Law-র নোট সেই যে বুক-কেস্-বন্দী হলো, তার পর আর তারা বাইরের আলো-বাতাসের মুখদর্শন করতে পেলে না।

পরীক্ষার মাত্র পনেরো দিন বাকী। অম্বিকাচরণ একটা আসন্ন বিপদ থেকে আপাততঃ মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। পরের দিন টাকা জমা দেবার কথা, কিন্তু তা তার ব্যাঙ্কেই জমা রইলো, এবং সে হিসেব করে দেখলে, তার একাউণ্টে আছে ঠিক ছ-পাউণ্ড। সুতরাং বত্রিশ্ গাম্ পাঁচ, পাঁয়ত্রিশে একটা স্যুট এবং একজোড়া গাম্-ফর্ম্ হয়ে যাবে। পরীক্ষা দিলে যে এক গিনী চলে যেত, এবং তা হলে সে যে আর পেকার্ডস্ খুন্-এ যেতে পারতো না, সে-কথা মনে করে স্বেচ্ছায় পরীক্ষা না দেওয়ার জন্যে সে বিবেকের তাড়না থেকে নিষ্কৃতি পেলে। এবং সারাদিন

বেলাবেলায় হ্যাম্পস্টেড্ হীথের ফাঁকে-কোণে ঘুরে বেড়িয়ে পুনঃপুনঃ স্বগতোক্তি করতে লাগলো—To be in England, now that April's h e r e !

তিন দিন পরে রমেনের স্যুট আনবার কথা। অম্বিকাচরণ হীথ পার হয়ে হাই গেটে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো এবং স্যুট আনবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রমেন বোসকে রীতিমত আশ্চর্য করে দিলে। তার অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ-রূপে সে একটা লম্বা যুক্তি দিলে—এ টার্ম্ টায় পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠলো না ভাই, কিছুই তৈরী হয়নি। একটা ক্লাস না পেলে বাড়ীতে লিখবো কী? তাছাড়া আবার এই তো "জ্যাকে"র পরেই পরীক্ষা, দেখে নিস্ ভালো ফল হবে। তা ভাবছি কি জানিস, হাতে ঠিক দু-পাউণ্ড্ আছে, একটা স্যুট করিয়ে নিলে হয়, অমন সস্তা, সাধারে পয়সার কিছু নেই। চল্ আমাকেও একটা কাপড় পছন্দ করে দিবি।

রমেনের স্যুট তৈরী হয়ে ছিল। দোকানে ঢোকামাত্রই ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটা দাঁত-খোঁচা পালকটাকে পকেটে পুরে আলা-মিষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে রমেনকে তা ট্রাই করতে বললে। এবং রমেন পর্দার ওপাশে গিয়ে নতুন স্যুট পরে বেরিয়ে এলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে—Look Miss, hau d'ye loike this gennlem'n in this, eh ? অম্বিকাচরণের মনে হলো, যেন রমেনকে এই নতুন স্যুটে মেয়েটির সত্যিই ভালো লেগেছে, কারণ এবার তার বিষাদ-ভরা ডাগর ডাগর চোখে কেমন যেন

একটু কৌতুকের ছায়া পড়লো, যেন পরিচয় থাকলে একটা ঠাট্টার কথাও বলতে পারতো। রমেনের দিকে তাকিয়ে বললে—I rather like the gentleman in that shade you know, and hasn't it fitted him just nicely ?

দাম চুকিয়ে দিয়ে রমেন তার স্যুটের প্যাকেটটা বগলে চেপে ধরে অক্স্‌ফোর্ডী তির্যক ভঙ্গীতে পাইপ ধরালে, তারপর অম্বিকাচরণকে একটা good turn করবার জন্যে দোকানের মালিককে বললে—How about making a similar thing for my friend ? And would this young lady choose the proper shade for him ? মেয়েটি আবার যেন একটু সংকোচভরে সামনে-মেলা খাতার ওপর চোখ নামিয়ে নিলে। ওয়েস্ট-কোট পরা লোকটি একরাশ কাপড় এনে তার সামনে ধরে দিয়ে বললে—Well Miss, 'ere ye are, do the choosin' for this gennlem'n, will yuh please ? মেয়েটি সলজ্জভাবে অম্বিকাচরণের দিকে তাকিয়ে বললে—You are a little fairer than your pal, aren't you ? I think this lighter shade would do beautifully for you. অম্বিকাচরণের মনে হলো, fairer কথাটার ওপর যেন একটু জোর পড়লো। হ্যাঁ, রমেনের চেয়ে সে ফর্সা বৈ কি ! তার কল্পনার চক্ষে ফুটে উঠলো তার নিজের মূর্তি, নতুন স্যুটটা পরে সে পর্দার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে ঐ মেয়েটি। তারপর এদিকে একটু যাওয়া-আসা করলেই তার

সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যাবে। তারপর সামনেই সামার ভেকেশন্‌, রবিবার-রবিবার তাকে নিয়ে গ্রামে বা সমুদ্রের ধারে র‍্যাম্বলে বেরুনো যাবে। তারপর সবুজ, ছায়াভরা চেস্টনাট্‌-এর তলায় বসে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুদূর তরঙ্গায়মান মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা, কখনো একটা ডেজী দিয়ে তার মুখের ওপর সুড়সুড়ি দেওয়া।

ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটি তার গলায় ঝোলানো গজ-ফিতের একদিক ধরে টানতেই সেটা আগের মতই সর্পিল ভঙ্গীতে মাটিতে এসে পড়লো।—Will you please take down the measurements, Miss?—মেয়েটি খাতার ওপর চোখ নামিয়ে মাপ টুকতে লাগলো—ছাতি এত ইঞ্চি, গলা এত, কোমর এত··· দর্জি এবার অম্বিকাচরণের উরুমূল থেকে পা পর্যন্ত ফিতেটাকে টেনে ধরলো, লম্বা এত ইঞ্চি। অম্বিকাচরণের মনে হলো, মেয়েটি যেন সন্তর্পণে খাতা থেকে চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো। পেন্টুলেনের পায়ের মাপে মানুষের দৈর্ঘ্য অনুমান করা যায় বৈ কি! মেয়েটি হয়তো আগে বিশ্বাস করতো না, সে রমেনের চেয়ে অনেক, অনেক ঢ্যাঙা; রমেন অবশ্য ছিপ্‌ছিপে, কিন্তু মেয়েরা তো বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার পুরুষের কাছেই বেশীর ভাগ আত্মসমর্পণ করে। দ্রাম্‌-ফসের মাপ নেবার সময়েও অম্বিকাচরণের মনে হলো, তার মোজা ও প্যান্টেলুনের মাঝ-খানের অনাবৃত fairer অংশটির দিকে মেয়েটির চোরা চাহনি নিক্ষিপ্ত হলো।

বাইরে এসে অম্বিকাচরণ তার-পক্ষে-অসাধারণ ক্ষিপ্র-গতিতে পথ চলতে লাগলো। হরেন বোস তার পিঠ চাপড়ে বললে—একদিন খাইয়ে দিস্, কেমন?

এর পর তিন দিন অম্বিকাচরণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হ্যাম্প্‌স্টেড্‌ হীথে র‍্যাম্‌ব্‌ল্‌ দিয়ে বেড়ালে, এবং যদক্ষের ঈষদুষ্ণ বিগ্রহগুলি কাফি, স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ এবং Lawrence-এর কবিতার বই আর Sterne-এর ভ্রমণবৃত্তান্তের সাহচর্যে ছুহু করে কেটে গেল।

অবশেষে তিনদিনের অপেক্ষিত শুক্রবারটি অরুণোদয়ের পূর্বেই অম্বিকাচরণের ঘরের পর্দা ঠেলে তার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ালো। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে সে সকাল আটটার অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট্‌ সেরে পিকাডিলীর এক শৌখীন নাপিতের দোকান থেকে তার আকুঞ্চিত কেশদামে একটা trimming-all-round লাগিয়ে এলো। Hector Pow-র বাড়ীর ভালো পোষাকটা বোসে দিয়ে ঝেড়ে মুছে, ন্যাফ্‌থালিনের গন্ধ দূর করে, ট্রাউসারটা প্রেসে চড়িয়ে বিকেলের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করে রাখলে। সারাদিন বিশ্রাম করে কান্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সে আজ বাড়ীতেই লাঞ্চ্‌ করলে, এবং ঘণ্টাদুই দিবানিদ্রা দিয়ে নিলে। তার পর বিকেল হতে না হতেই চা না খেয়েই যাত্রা করলে শেফার্ড্‌স্‌ বুশ্‌-এ।

রোজকার মত সেদিনও ওয়েস্ট্‌-কোট পরা লোকটি কোরের

কাছে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছিল। দূর থেকে অম্বিকাচরণকে দেখে বেশ একটু আড়ম্বর করে অভিবাদন জানালে, তার এবং তার বন্ধুর কুশল-প্রশ্নও বাদ গেল না।—হ্যাঁ-াা-াা, স্-উ-ট্ তৈরী, বেড়ে খুলেছে, মিস্-এর পছন্দ, ঠিক না হয়ে যায় না, কাপড়টা খুবই দামী, তবে মিস্ যখন পছন্দ করে দিয়েছেন তখন তার জন্মে অবশ্য এক্সট্রা কিছু নেবে না।

দোকানে ঢুকতেই লোকটি অম্বিকাচরণের হাতে বেশ বড় আকারের একটা পুলিন্দা গছিয়ে দিয়ে রসিদ লিখতে লাগলো।—না, না, ও আর ট্রাই করতে হবে না। Pucca finish, ভারতবর্ষে কী বলে "পাক্কা" না "পুক্কা"? হেঁ, হেঁ, তার এক খাসতুতো ভাই বোম্বাইয়ে আছে, প্রকাণ্ড ব্যবসা তার। আচ্ছা, লর্ড্ রেডিং সম্বন্ধে অম্বিকাচরণের ধারণা কী? সে হিন্দু না মুসলমান? আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের যে মারামারি হচ্ছে তাতে ভারতীয় মুসলমানদের মনের ভাবটা কী? ভারতবর্ষের পক্ষে British Commonwealth of Nations-এর অংশ হয়ে থাকাই অধিক মঙ্গলকর নয় কি?...

অম্বিকাচরণের চোখ-দুটো সমস্ত দোকানটাকে তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করে এতক্ষণ পরে বিশ্বাস করলে, সে সত্যিই আজ দোকানে নেই—মেয়েটি নেই।

তার সুদীর্ঘ স্বপ্ন-স্বপ্নের সূচনা ইহুদী বাক্-বহুলতায় তিক্ত হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, মেয়েটি হয়তো ইচ্ছে করেই আজ অনুপস্থিত হয়েছে। ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায়, হয়তো

সে চায় না। হয়তো এসব ইহুদী দোকানদারের কারসাজি, যাতে আর একটা স্যুট করাবার জন্যে আবার আসতে হয়। গত তিন দিন ধরে অম্বিকাচরণের মনে মেয়েটি যেন তার অনেক কাছে সরে এসেছে। তাই তার ওপর কেমন অভিমান হলো, ভারতীয় বলে হয়তো সে উপেক্ষিত হয়েছে। সেই বা কেন তার নিজের জাতীয় সম্ভ্রমকে হীন করবে ?

বাকী দাম চুকিয়ে দিয়ে অম্বিকাচরণ স্যুটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। পয়সা গুণে নিয়ে দোকানদার পেছন থেকে ধন্যবাদ এবং অভিবাদন জানালে। ঠিক সেই সময়ে রাস্তার ওপার থেকে মেয়েটিকে দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা পোষাকের গাঁটরীর ভারে নুয়ে পড়ে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তেমনি বিষাদ-ভরা তার ডাগর ডাগর চোখ, শীর্ণ, ক্লান্ত মুখ, জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা সে-মুখের ওপর এলো-মেলো রেখা টেনে দিয়েছে।

অম্বিকাচরণ আপন কর্তব্য স্থির করতে না পেরে হন্-হন্ করে এগিয়ে চললো। একটু দূরে গিয়ে সে পেছন ফিরে দেখলে, মেয়েটি তার বোঝা নিয়ে কোনো রকমে রাস্তা পার হচ্ছে।

ওয়েস্ট্-কোট পরা লোকটা তাকে সাহায্য করবার জন্যে এক পাও এগিয়ে গেল না। ভারবাহী মেয়েটির দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

আকাশের গায়ে পাৎলা টুকরো-টুকরো মেঘগুলো যেন পৃথ্বীর গায়ে তুলোর আঁশ। রাস্তার ওপারের পুরোনো জিনিষের দোকানটাকে দূর থেকে ফোকলা হাঁর মত দেখাচ্ছে। এক টিন Balkan Sobranie কেনা যাবে নাকি?......

অম্বিকাচরণের বাস্ এসে পড়েছে।

কলিকাতা,
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

কান্না-গাছ

লন্ডনে সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষাটা ঠিক যে-সময়ে হয়ে থাকে সে-সময়টা অন্ততঃ পড়াশুনো করবার উপযোগী নয়। তার মাস দুই আগেই "বারের" ছাত্ররা পরীক্ষা শেষ করে কন্টিনেণ্টে টহল দিতে বেরিয়ে পড়ে, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো ও এর আগেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণদয়ালের সে-বার শেষ দান, তাই তার বন্ধুরা "চিরন্তন দিন" প্রত্যক্ষ করবার জন্যে স্পিট্স্-বের্গেন যাত্রা করলেও তাকে লন্ডনেই থাকতে হলো। অবশিষ্ট পরিচিতদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করবার অভিপ্রায়ে সে তার গোল্ডার্স্ গ্রীনের বাসা তুলে দিয়ে ওয়াণ্ডস্ ওয়ার্থে রুমস্ নিলে এবং সিভিল্ সার্ভিস্ পরীক্ষায় আপনাকে সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ প্রতিপন্ন করবার জন্যে অর্গলবদ্ধ অবস্থায় উঠে পড়ে লেগে গেল।

ওয়াণ্ড্স্ ওয়ার্থ্ ভারতীয় ছাত্রদের কাছে স্বল্প-পরিচিত হলেও সেখানেও যে উত্তর-লন্দনের দ্বীপের মত প্রকাণ্ড একটি কমন্ বিদ্যমান, তা কৃষ্ণদয়ালের ঠিক জানা ছিল না। দু-এক দিন আকাঙ্ক্ষা দমন করে একদিন সে তার পুরানো অভ্যাস মত খানকয়েক বই নিয়ে লাঞ্চের পরে ওয়াণ্ড্স্-ওয়ার্থ কমন্-এ গিয়ে হাজির হলো।

হ্যাম্পস্টেড্ অঞ্চলে বে-ব্যসনের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে এ-পাড়ায় বাসা তুলে নিয়ে এলো, এখানেও ঠিক সেই ঘুরিবার আকাঙ্ক্ষাটিই তাকে আগের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। এখানেও সে আবিষ্কার করলে নীচু, ভিজে ঘাস্-জমির ওপর উইলো গাছগুলো শিকড়হারা প্রবৃত্তির মত মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে, একটু দূরে ফুলন্ত যে-গাছগুলোয় আগুন লেগেছে, এখানেও মর্মরিত পপ্লারের সারি কান্ হব্-এর ছবির মত আনন্দে মুখর।

জুনিপার গর্স্ আর বুনো স্ট্রবেরীর ঝোপে-ভরা খানিকটা মাঠ পার হয়ে কৃষ্ণদয়াল একটা উঁচু ঢিপির ওপর উঠে এলো। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, মানুষের পায়ের চিহ্ন-রচা একটি সর্পিল পথ ঘুমন্ত অজগরের মত মাঠের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। লোকালয় অ-স্ফুট বিস্মৃতির মত দূরান্তরে অপসারিত। দুটো খুঁটির ওপরে তক্তা আঁটা বসবার জায়গাটার কাছে এসে কৃষ্ণদয়াল দেখলে তার মাথার ওপর ছোট একটি লিণ্ডেন ঝির্-ঝিরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই বোধ

হয় তার প্রথম ফুল ফোটানো, গাঢ় সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁপা রঙের ছোট ছোট গোটাকয়েক ফুল। তাদেরই গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরপুর, আর সেই গন্ধে-ভরা নিস্তব্ধতার ভেতর শব্দের বুদ্‌বুদের মত কতকগুলো তামাটে রঙের বোলতা আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে চলেছে।

লিণ্ডেনের উষ্ণ গন্ধ আর বোলতার স্বগত গুঞ্জন দিবা-স্বপ্নের মত আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিপ্রহরের এই মধুর অবসরটুকু উপভোগ করবার জন্যে কৃষ্ণদয়াল বইয়ের ব্যাগটার ওপর মাথা রেখে বেঞ্চীর ওপর শুয়ে পড়লো। গাছটার ঝির্‌-ঝিরে ছায়া তার মুখের ওপর কতকগুলো অদ্ভুত প্রকাশ-ভঙ্গিমার মত ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্ব ও অপসৃত হতে লাগলো। আপন একাকিতায় সমাহিত এই লিণ্ডেন, অথচ কৃষ্ণদয়ালের মনে হলো সে যেন জন্মান্তরের স্মৃতির মত এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তার সান্নিধ্যকে নিতান্ত সহজভাবে উপলব্ধি করছে। তার ছায়ায় যেন একটি গোপন স্পর্শ। উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের যে-বন্ধুতা তার কোনো দৈহিক প্রকাশ নেই, অন্তরের নীরন্ধ্র অধস্তলে যে-অনুভূতি উন্মেষ হয়ে ওঠে তার বাহ্যতা শুধু দৃষ্টি আর ছায়া। গোড়া থেকেই গাছটাকে কৃষ্ণদয়ালের কেমন ভালো লেগে গেছে। সে মনে মনে স্থির করলে, রোজ দুপুরে এখানে এসে পড়তে বসবে।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, তিনটে বাজে বোধ হয়, অথচ আজ সারা দুপুরে কৃষ্ণদয়ালের একটি পাতাও পড়া হয় নি। আজকের দিনটা থাক, নতুন জায়গা। সমস্ত লণ্ডন শহরটাকে একটু

একাকিত্ব উপভোগ করবার উপায় নেই, চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ, পথে, টিউবে, বাসে মানুষের সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি, পার্কে, হাটে, সর্বত্র মানুষ, তার শ্বাস-প্রশ্বাসে উষ্ণ, ভারাক্রান্ত বায়ু, তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, তার অসহনীয়, আপত্তিকর উপস্থিতি। ওয়াণ্ডস্‌ ওয়ার্থের এ-জায়গাটিতে এসে কৃষ্ণদয়াল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বিকেল পর্যন্ত বাকী সময়টুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে কৃষ্ণদয়াল Way-side Flowers বলে একখানা বই খুলে তার ছবি ও বিবরণগুলো অলসভাবে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো। মনে মনে সঙ্কল্প করলে, পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সে বইখানা নিয়ে ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে এইসব নাম-না-জানা ফুলের সন্ধানে বেরুবে। সব-গুলোর অবশ্য দেখা পাওয়া যাবে না, কারণ জুন-মাসেই অনেক ফুল শেষ হয়ে যায়। তবে স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েল্‌স্‌-এ অনেক রকমের ছোট ছোট বনফুল অগস্ট মাসেও টিকে থাকে। চেল্‌সীর ফ্লাওয়ার শো'তে সে যে কতকগুলো ট্যাপের বইয়ের মত ঘাসফুল দেখেছিল, সেগুলো নাকি লেক ডিস্ট্রিক্টে দেখা যায়, তাছাড়া খুব ছোট ছোট শাদা রঙের কন্দ-প্রাণ্ড ওয়েল্‌স্‌-এর পাহাড়গুলোতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। যাবার আগে mushroom সম্বন্ধেও একখানা বই কিনে নিতে হবে। ওয়েল্‌স্‌-এর পাহাড়ে নাকি নানান্‌ রঙের নানান্‌ রকমের পাতাল-ফোঁড় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদয়ালের হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়লো। পায়ে-

চলার পথটা দিয়ে একটি মেয়ে টিলাটার দিকে এগিয়ে আসছে, তার আগুন রঙের স্কার্ট আর কমলা রঙের জাম্পার পড়ন্ত রোদে ঝলমল করছে। টিলাটার ওপর উঠে এসে মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লো। কৃষ্ণদয়ালের মনে হলো, সে আর একজনের নিভৃত পলায়নের আশ্রয়টিতে অনধিকার-প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি বইয়ের ব্যাগটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—নিশ্চয়ই আমি আপনার রোজকার বসবার জায়গাটি দখল করেছি।

Not at all. বসুন না। আমি এখানে প্রায়ই আসি বটে, তবে বেঞ্চীটাতে অন্ততঃ দুজনের মত জায়গা আছে।

আমারও যাবার সময় হলো। আপনার আপত্তি না থাকলে অবশ্য আর একটু বসা যেতে পারে। আমার এ জায়গাটা ভারী ভালো লেগেছে, বিশেষতঃ এই সিডেন-গাছটাকে।

আশ্চর্য্য! এই সিডেনটা? আমারও ভারী ভালো লাগে একে। এই উঁচু জায়গাটার ওপর ও একেবারে একা। আপনি দেখছি বুনো ফুল ভালোবাসেন।

হ্যাঁ, ওটা আমার একটা ব্যসন বললেই হয়। এই দেখুন না, পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে এসে এই বইটা খুলে পড়ছিলাম।

আপনি ছাত্র? ভারতীয় নিশ্চয়।

হ্যাঁ। আপনি?

আমার বাড়ী আয়ার্ল্যাণ্ডে। কলেজে [illegible], আমার কাজ হয়ে ওঠে নি।

কথায় কথায় মেয়েটির সঙ্গে কৃষ্ণদয়ালের পরিচয় হয়ে গেল, তার নাম শীলা, Sheila O' Henry. আয়ারল্যাণ্ডের অর্ধেক মেয়েদের নামই বোধ হয় শীলা, মেয়েটি হেসে বললে, মার্কিনী লেখক O' Henryর সঙ্গে অবশ্য তার কোনো আত্মীয়তা নেই, যদিও সবাই সে-কথা জিজ্ঞেস করে।

কৃষ্ণদয়ালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শীলা হেসে শুধালো—সাহস করে একজন অপরিচিত মেয়ের পাশে বসতেই পারলেন না এতক্ষণ? আপনি তো ভারী লাজুক।

এ আর এমন কি দুঃসাহসিক কাজ?—বলে কৃষ্ণদয়াল বেঞ্চীটার একধারে বসলো।—তাছাড়া আপনার সঙ্গে তো একরকম পরিচই হয়ে গেছে।

শুনে সুখী হলাম। লণ্ডন আপনার লাগে কেমন?

কেন, বেশ তো।

একা একা মনে হয় না?

তা একটু হয় বৈকি।

একটু? আমার মনে হয় লণ্ডনের মত নির্জন শহর পৃথিবীতে নেই।

আমার কিন্তু একা থাকতেই ভালো লাগে।—কৃষ্ণদয়াল বললে।

তা জানি, আমায় আসতে দেখে আপনি যেভাবে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে যাচ্ছিলেন।

না আপনাকে দেখে পালাতে যাবো কেন? আমার আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি এই কাক-তাড়ুয়াটিকে দেখে হয়তো সৌজন্যক

ভয় পেয়ে যাবেন। তাছাড়া ভেবেছিলাম, হয়তো আর কারো সঙ্গে আপনার এ-জায়গাটিতে র‍্যাঁদেভু আছে।

র‍্যাঁদেভু! আপনার অনুমান মিথ্যা হয় নি। তবে সে র‍্যাঁদেভুতে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বাধার সৃষ্টি করতো না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমার র‍্যাঁদেভু এই লিণ্ডেন-গাছটার সঙ্গে।—শীলা কৃষ্ণদয়ালের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসলে। তারপর নিজেই বইয়ের ব্যাগটাকে সরিয়ে দিয়ে বললে—ভালো হয়ে বসুন না, আপনার আধখানা যে ডালের ওপর পাখীর পুচ্ছের মত শূন্যে ঝুলছে!—উপমার জেরটা উহ্য রেখে শীলা আবার কৃষ্ণদয়ালের দিকে চেয়ে এবার সশব্দে হেসে উঠলো। বললে—ভাগ্যিস আপনি নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না! নাহলে দেখতে পেতেন, আপনার ওদিকটাকে দস্তুরমত পাখীর পুচ্ছ বলে ভুল করা চলে।

একটু লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণদয়াল এবার শীলার বেশ কাছাকাছি এসে বসতে বাধ্য হলো, কারণ বেঞ্চীটাতে সাধনের সুষ্ঠু উপভোগ করবার পক্ষে গাত্রসংলগ্ন দুটি মানুষের বেশী বসবার জায়গা ছিল না। শীলা অনুমতি না নিয়েই বইয়ের ব্যাগটা একপাশে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলে, তারপর কৃষ্ণদয়ালের দিকে চপল দৃষ্টি হেনে শুধালো—আপনি কোনো অস্বস্তি বোধ করছেন না তো?

অস্বস্তি বোধ করবো কেন!

এমনি জিজ্ঞেস করলাম, করতেও তো পারেন! সবাই মেয়েমানুষের সংস্পর্শ পছন্দ না করতেও পারে, তাই আর কি।

আপনি পুরুষ হলে নিশ্চয়ই মীসোজেনিস্ট্ হতেন।—কৃষ্ণদয়াল একটা চলনসই গোছের রসিকতা করতে চেষ্টা করলে।

আশ্চর্য নেই।—শীলা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, তারপর বললে—পুরুষমানুষ হলে অন্ততঃ স্ত্রীলোকের আস্বাদটুকু যে কী তা উপলব্ধি করতে পারতাম। পুরুষমানুষের লেখা কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ইত্যাদি পড়ে এক এক সময় আফ্‌শোস হয় এই ভেবে যে, হয়তো আমরা একটা অতি নিবিড় সুখ থেকে একেবারে বঞ্চিত। মেয়েমানুষ বলেই আমরা স্বভাবতঃ মীসোজেনিস্ট, তাই নয় কী? আপনার হাতের আংটিটায় ওটা রুবী বুঝি? আপনি বিবাহিত নিশ্চয়।

নিশ্চয় মানে?

আপনার হাতে আংটি, তাই অনুমান করছি।

আমি একজন হতভাগ্য পুরুষ যার এখনো স্ত্রীলাভ ঘটে নি।

শীলা কৃষ্ণদয়ালের হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রেখে আংটিটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। তারপর বললে—ভারী সুন্দর কাজ তো!

আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তো অনায়াসে ওটা খুলে নিতে পারেন।

না। আপনি যাকে ভালোবাসবেন তাকে দেবেন।

ভালো না বাসলে বুঝি দেওয়া যায় না?

হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু নেওয়া যায় না।—শীলা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলে।

তাহলে দেখছি আমার এই বয়েসের মত আঙুলের সহবাসেই থেকে সারা জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

কেন, আপনি বুঝি কাউকে ভালোবাসেন না?—লীলা জিজ্ঞেস করলে।

ভালোবাসা জিনিসটা এক তরফা, তাই ভালোবাসতে আত্ম-সম্মানে বাধে। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই নি।—কৃষ্ণপ্রসাদের মনে হলো, সে একটা দস্তুরমত সারগর্ভ কথা বলেছে। লীলা কিন্তু তার কথায় হেসে উঠলো, বললে—জীবনে দেখা গেছে, আপনার মত বীরপুরুষরাই ও-আত্মসম্মানটুকু বলি দিয়েছেন সবার আগে। মেয়েমানুষের ভালোবাসাকে পুরুষের বন্ধুতার সমগোত্রীয় মনে করেন বলেই নানা মনগড়া অভিমান জমা করেন আপনারা। ওসব কিশোর বয়েসের সৌখিন প্রেম, ইস্কুল-পড়া ছেলেতে ছেলেতে আর মেয়েতে মেয়েতে। তাই সে-বয়েসে একজনের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া অপর জনের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু যেখানে সরল ও মানীর সম্পর্ক সেখানে প্রকৃতির ওসব মানসিক বিলাসের ধৈর্য দেখা যায় না।

আপনার সুদীর্ঘ গবেষণার অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

বেশী পড়াশুনো করলে সহজ জিনিস জটিল হয়ে যাওয়াই সম্ভব। আমার মনে হয়, ভালোবাসা মানে প্রকৃতির সৃজন-শক্তির তাড়নায় এক কর্তৃক অপরের অধিকার। অপর পক্ষের সম্মতি বা অনুমতি এর পরের ধাপ। সুতরাং আপনি ভালো-বাসলেই হলো। তাই বলছিলাম, আপনি আপনার এই

সুন্দর আংটিটি এমন মানুষকে দেবেন যাকে আপনি দেবার যুক্তি স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে দেওয়াতে পারবেন।

একটু চুপ করে থেকে শীলা হঠাৎ বললে—আমাদের দেশে পেলে আপনাকে যে-মুস্কিলে পড়তে হতো! আয়ারল্যাণ্ডের মেয়েগুলো ভারী বোকা হয়, জানেন, বিদেশী দেখলে তারা একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কী রকম ?

কী রকম, এখনও বুঝতে পারলেন না ? আপনি ভারী সরল মানুষ, এত দূরে দেশ ছেড়ে এলেন কী করে ? যাই হোক, আয়ারল্যাণ্ডে যাবেন না যেন !

কেন ?

কেন ?—শীলা কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চেয়ে বেশ একটু নিগূঢ়ভাবে হাসতে লাগলো।—কেন ? তাও আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

না দিলে বুঝতে পারছি কৈ ? জানেন, সব জিনিষ আমার মাথায় ঢোকে না, যেমন ধরুন বিজ্ঞান।

আপনি এখনো ছেলেমানুষ। বয়েস কত ? বাইশ ? তাই বলুন ! চশমা পরে বিজ্ঞ সেজে বসে থাকলেই হয় না। আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনার বয়েস ত্রিশ পঁয়-ত্রিশের কম নয়। যেমন গম্ভীরভাবে বসে বসে পড়ছিলেন ! বাইশ ! হা-হা-হা।—শীলা দুষ্টামির হাসি হেসে উঠলো। তারপর কৃষ্ণদয়ালের চোখ থেকে শেলের চশমাটা খুলে নিয়ে নিজেই

তার বুক-পকেটে গুঁজে দিয়ে বললে—ওটা পরে লোককে ফাঁকি দেবার দরকার কী ? দেখি, তাকান দেখি আমার দিকে। ও ভগবান, আপনার বয়েস বাইশও হয় নি যে, অথচ ঐ কাচ-দুখানাতে আপনাকে এমন বুড়ো দেখায় !

দেখালোই বা বুড়ো ! জানেন, আমার আধ্যাত্মিক বয়েস অন্ততঃ শ'খানেক।

তা না হলে আর আপনি বুনো ফুলের ক্যাটালগ পড়ে সময় কাটান ! আপনি যদি বলেন আপনি প্রজাপতি আর কাকটিকিট জমান, আপনার বাড়ীতে একটি ছোটো-খাটো জন্তুদের যাদুঘর আছে, আপনি নিয়মিতরূপে Country Life পড়ে থাকেন, এবং আপনি বছর চল্লিশ ধরে পেন্সন ভোগ করছেন, তাহলে তার একটা কথাও আমি অবিশ্বাস করবো না।

আমাকে কি এতই বুড়ো দেখায় ?

দেখায় বৈ কি ঐ কাচদুখানা চোখে দিলে।

আচ্ছা এইবার আমার পালা। আপনার বয়েস কত ?

মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা নয়, জানেন তো ? তাছাড়া জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তর পাবেন না, তাও কি জানেন না ?

তবুও বলুন না, আপনার বয়েস কত।

বলবো না। কেন ? আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন নাকি ?

যদি বলি হ্যাঁ ?

তাহলে আপনাকে তার কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি। আইরিশ মেয়েদের আপনি চেনেন না।

কেন?

ছায়া কাহিনী।

অর্থাৎ?

তারা কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেদের চুষে খেয়ে ফেলে।

তাই নাকি?

হুঁ, তাদের খপ্পরে পড়বেন না।

তবুও একবার পরখ করে দেখতে ইচ্ছে হয়।

বেশতো আসবেন খাক্‌, অন্ধকার হয়ে গেলে। এখন এগারোটার আগে অন্ধকারই তো হয় না। আসবেন এগারোটার সময় এই জায়গাটিতে।

বেশ। ঠিক তো?

হ্যাঁ। অতবড় একটা রিস্ক্‌ নিতে আপনার ভয় করবে না? পরে আমাকে দোষ দেবেন না কিন্তু।

না। ঠিক আসবো রাত এগারোটার সময়ে।

ঠিক?

ঠিক। Honour bright.

কৃষ্ণলাল বাড়ী ফিরে দেখলে চায়ের পাট অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে, প্যান্ট্রি থেকে ঠং-ঠং করে বাসন ধোয়ার আওয়াজ আসছে। বাড়ীর পেছন দিকের লনটার মাঝখানে একঝাড় ফুল, ছোট ছোট সাদা ফুলের ঝুঁটির মত ফুল, পাতায় বাঁধানো,

সোঁদা গন্ধ। কৃষ্ণদয়াল তার কাছে বসে অন্যমনস্কভাবে তার বসানো পাতাগুলো ছিঁড়ে শুঁকতে লাগলো। মেমমেয়েটি পার্টির জানলা দিয়ে লোকটির কর্দমাক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সজীব সঞ্চালন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। কুড়ি-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি নিবিষ্ট মনে চায়ের বাসন ধুচ্ছে, কাপগুলোকে রগড়ে রগড়ে ধোবার সময়ে তার কাঁধদুটো ওঠানামা করছে। কৃষ্ণদয়াল জানলা থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। ঐ লোকটিই তো দিন দুই আগে তার বিছানার পাশে বেড-টী আর গরম জল রেখে যাবার সময়ে তার গালটা টিপে দিয়ে বলেছিলো, Get up, me choc'late-boy. বাড়ীর চাকরাণীদের এধরণের অসংবৃত ব্যবহারকে সে কালো ভারতীয়দের প্রতি সাধারণ অবজ্ঞা বলেই মনে করেছিল। তানাহলে একজন ভদ্র বোর্ডারের গাল টিপতে যাবে কেন? কিন্তু এ-কদিন সে লোকটির ছোট ছোট কথার অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেও বুঝতে পেরেছে; লোকটি যেন তার কাছ থেকে কী একটা দাবী করতে সুরু করেছে। কাল সন্ধ্যায় যখন কেউ বাড়ী ছিল না তখন সে লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে তার বইখানা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—D'ye unde'stand, me choc'late-boy? তারপর একটু থেমে তার দিকে চেয়ে বললে—Sai, yes. —কৃষ্ণদয়াল ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। আজ সকালে ব্রেকফাস্টে সে-ই পেয়েছিল সব চেয়ে বড় সসেজ-দুটো। খাবার সময়ে তার সমস্ত গা ঝিন-ঝিন করে উঠেছিল। লোকটির আচরণের কথা ভেবে সকালে তার মনে যে-পরিমাণে বিতৃষ্ণা

জন্মেছিল, এখন ঐধরণেরই কোনো একটা ছোটোখাটো আকস্মিকতার জন্মে তার মন ঠিক ততখানি প্রতীক্ষমান হয়ে উঠলো। খোকী যদি হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে রান্না-ঘরে নিয়ে গিয়ে তার জন্মে লুকিয়ে-রাখা বড় এক টুকরো প্লাম্-কেক্ দেয় একবাটি গরম চায়ের সঙ্গে তো সেও তার গালে একটা টোকা মারবে, মারবে বৈকি।

দোতলার জানলা থেকে ল্যাণ্ড্লেডীর মেয়ে ডরথীর গলা শোনা গেল—মিঃ মিটার রু-ম্যাক্সটাকে শেষ করে ফেললেন দেখছি! আজ যে শনিবার সে-কথা আপনার মনে আছে কী?

একক্ষণ পরে কৃষ্ণদয়ালের স্মরণ হলো, কয়েকদিন আগে সে ল্যাণ্ড্লেডী ও তাঁর মেয়েকে সিনেমা দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কতকটা কথার ছলেই সিনেমার প্রসঙ্গ তুলেছিল, এবং ভেবেছিল ও-পক্ষ থেকে তার আর পুনরুক্তি হবে না। একটু ইতস্ততঃ করে বললে, খুব মনে আছে, মিস্ কিং, ছ'টার শো'তে যাওয়া যাক চলুন।—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের থার্মোমিটারটা একবার দেবেন?

থার্মোমিটার?

হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেছে, তাই।

আপনি যেমন জানলার ধারে বসে বসে যাও দুটো অবধি পড়েন! আসুন লাইব্রেরী-ঘরে, দেখি জ্বর হলো নাকি আবার।—ডরথীর স্বরে একটু যেন বেশী আন্তরিকতা প্রকাশ পেল। কৃষ্ণদয়াল প্যান্ট্রির জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলে, খোকী ইশারায় তাকে

দেহকে বারণ করছে। সাবান-মাখা দু-খানা হাত নেড়ে যখন সে কোন প্রত্যুত্তরের সংকেত পেলে না, তখন সে ডানহাতের আঙুলগুলো ঠোঁটে ঠেকিয়ে তার প্রেম-পাত্রের দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলে।

কৃষ্ণদয়াল এবার তার জীবনে এই প্রথম তার একটি চোখের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত করতে বাধ্য হলো। সোফী শয্যাটিতে নিঃশব্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। ডরথী ওপর থেকে ডেকে বললে—কৈ, মিঃ মিটার দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

ভাবছি জ্বর মাপাটা ঠিক হবে কিনা। It'll be tempting the devil, you see. এমনিই তো শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, তার ওপর জ্বর মাপলে নিজেকে আস্কারা দেওয়া হবে না কী?

Not in the least. আপনি শুয়ে পড়ুন, মিঃ মিটার। আসছে হপ্তায় সিনেমায় যাওয়া যাবে, কেমন? আমি অ্যাস্পিরিনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সোফী! সোফী—

এর কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণদয়াল মিসেস ও মিস্ কিডের হাঁক-ডাকে শয্যাশায়িত হলো, এবং অধোবদন সোফী এক গেলাস লেবুর রস ও দুটো অ্যাস্পিরিনের বড়ী দিয়ে যাবার সময়ে তার গালে একটা টোকা মেরে গেল।

কৃষ্ণদয়াল নিজের মধ্যে কেমন এক গোপন শিহরণ অনুভব করলে, কিসের এক বহিঃপ্রকাশের আকুতি, যেমন সে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কখনো কখনো উপলব্ধি করেছে। বাইশ বছরের জীবনী-শক্তি যখন অপর একটি বাইশ বছরের জীবনী-শক্তিকে

স্পর্শ করে তখন তন্তুতে তন্তুতে যে অগ্নি-অণু ফুলকি দিয়ে ওঠে তার নাম কামনা। কৃষ্ণদয়ালের শিরায় শিরায় কামনার আগুন জ্বললো। উঃ, ওখানে আলকহলের মত তা তার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও স্নায়ুগুলীকে উন্মুখ করে তুললে। কৃষ্ণদয়াল অপর একটি সত্তাকে নিতান্ত সন্নিধরূপে পেতে চাইলে।

গোর্কী ততক্ষণ বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। পাশের সিঁড়ি দিয়ে তরুণীর জুতোর শব্দ লাফ দিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল, ছুটির পোষাক আর বেশী দেরী নেই। বাড়ীতে মিসেস্ বিডের নৈতিক পুলিশীর প্রসাদে গোর্কী যদিও বা আবার তার ঘরে আসে তো সে রাত দশটার আগে নয়, এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে, তাও মিনিট খানেকের জন্যে।

রাত দশটা, তখনই তো তাকে কোনো একটা ছুতো করে বেরুতে হবে ওয়াণ্ডসওয়ার্থ কমনে, সেই লিণ্ডেন-গাছটার তলায়। চারিদিকে অন্ধকার তন্দ্রার মত নিবিড় হয়ে উঠেছে, একটু পরেই একটি ঋজু, সাবলীল ছায়ামূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো। লীলাই তো! ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না। আমিও তাই। তবে এলেন কেন? আর আপনি? তার পরই two hearts beating each to each.

কৃষ্ণদয়ালের কামনা থমকে দাঁড়ালো। এর পরের দৃশ্যটা নাটকীয়মত দীর্ঘ হওয়া চাই। লীলার বয়সটুকু কেমন যেন মনে পড়ে না। কৃষ্ণদয়ালের চেয়ে বয়েসে সে বেশ একটু বড় হবে বৈকি। কিন্তু লীলার পরিপূর্ণ যৌবনের ভেতর যে একটি নিষ্কৃত

আশ্রয় আছে, তার স্নিগ্ধ আকর্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ঐ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির যেটুকু মনে না পড়ে সেটুকু কল্পনায় ভরে নিতে হয়। লীলার আবিষ্ট চোখ-দুটিকে কৃষ্ণদয়াল চুমায় চুমায় বুজিয়ে দিলে। চিন্তায় আবার কিছুক্ষণের জন্যে ছেদ পড়লো। লীলার মুখখানি একটু উপর দিকে তোলা, "গোঙা" প্রতিমূর্তি-গুলোর মত। ওরহি যেমন বর্ষার জল আর চাঁদের আলো উন্মুখ হয়ে পান করে, লীলা যেন ঠিক তেমনি করে কৃষ্ণদয়ালের আদর উপভোগ করছে। ছবিটা এতক্ষণ পরে ধরা দিলে। হ্যাঁ, লীলা ঘাসের ওপর বসে তার দেহটাকে একটু এলিয়ে দিয়ে মুখখানিকে ওপর দিকে তুলে ধরেছে। তাই নয় কী? তারপর সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো। কৃষ্ণদয়াল তার উন্নত বুকের ওপর মাথা রাখলে।

টক্-টক্ করে দরজায় ঘা দিয়ে পোস্টো ঘরে ঢুকলো। তার মুখের ওপর একখানা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'Ere ye are, me choc'late boy, some'un's written yah a luv-letter. বাড়ীর চিঠি। আজ শনিবার। এর মধ্যেই নটা বেজে গেছে! দিওনের নকাবের শব্দও পায় নি সে। যাবার সময়ে পোস্টো এবার সত্যিই তাকে একটা চুমো দিয়ে গেল। তার ঠোঁটের ওপর কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ লেগে রইলো অনেকক্ষণ ধরে। বাড়ীর চিঠিখানা আজ না খুললে কেমন হয়? জানলা দিয়ে দক্ষিণে হাওয়ার মত খানিকটা বাতাস গায়ে লাগলো, মন-কেমন-করা, উদাসী বাতাস। কৃষ্ণদয়াল খাম খুলে বাড়ীর

চিঠি পড়তে বসলো। একখানা খামে খানচারেক চিঠি, বাবা, মা, তার ছোট ভাই পিনাকী আর বোন বল্লরী লিখেছে। সেই একঘেয়ে কথা, দু-বছর দেশ ছেড়েছে, আর কতদিন সে বিলেতে বসে থাকবে? আই-সি-এস্ পরীক্ষা যেন খুব ভালো হয়; চাকরী না হলে ধার-করা টাকা শোধ হবে কী করে? বিলেতে আসা পর্যন্ত খরচ হয়েছে পাঁচ-হাজার, তার সবটাই যে ধার-করা! পাওনাদাররা এর মধ্যেই তাগাদা সুরু করেছে। চারখানা চিঠিতেই সেই একই কথা। বল্লরী নিতান্ত ফরোয়ার্ড মেয়ে, চিঠিতে পণ-প্রথার কথা তুলে তার নিজের বিয়ের দায়িত্বের উল্লেখ করেছে। লিখেছে, এতে আমার মত একেবারেই নেই। কিন্তু আমার কথা ভেবে মার শরীর একবারে ভেঙে পড়েছে! তাই ভাবছি, আর জিদ করা উচিৎ নয়, অন্ততঃ তাঁর শরীরের দিকে চেয়ে। তুমি আই-সি-এস্ হলে আমাদের কী ফুর্তিটাই হবে দাদা, সত্যি! পিনাকী লিখেছে, তাকে টুইশানী করে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হচ্ছে, দাদা আই-সি-এস্ হয়ে এলে সে বিলেতে যেতে পারবে।

সব চিঠিগুলো পড়বার কৃষ্ণদয়ালের ধৈর্য থাকে না। পরীক্ষার আর মাত্র পনেরো দিন বাকী। এবারও অকৃতকার্য হলে সে বাড়ীতে লিখবে কী? দশটা বাজলো। শীলার সঙ্গে দেখা হবার আরো একঘণ্টা দেরী। এখন থেকে পোষাক পরতে সুরু না করলে সাড়ে দশটার আগে বেরনো যাবে না। লিণ্ডেন-গাছটার কাছে পৌঁছতে পৌনে-এগারোটা বেজে যাবে। শীলার আগেই

সেখানে পৌঁছতে হবে। কৃষ্ণদয়াল বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিলে। কিন্তু তার ভেতরটা অমন কাঁপছে কেন? দু-বছর আগে সে তার মার পা ছুঁয়ে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল, সে কথাটা কি এখন মনে না পড়লেই নয়? ধার-করা টাকা, সংসারের দায়িত্ব, মায়ের অসুস্থতা, নৈতিকতার বন্ধন। কৃষ্ণদয়াল ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করে আইনের বই খুলে বসলো—Compendium of Common Law. মনোগ্রাহী বিষয়। কয়েক পাতা অতিক্রম করার পর সে আস্তে আস্তে নিজেকে প্রকৃতিস্থ বোধ করতে লাগলো। Crime আর Tort-এর ফারাকটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে। Kenny-র চেয়ে এই বইটাতে বেশ পরিষ্কার ব্যাখ্যা। এইটা পড়লেই চলবে, ছুটির মধ্যে। Kenny, Pollock পড়বার সময় কৈ? আচ্ছা থাক্, Trespass-এর কেস্গুলো একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক্। হলের বড় গ্র্যাণ্ড-পা ঘড়ীটাতে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। কৃষ্ণদয়াল হঠাৎ বই বন্ধ করে নীচে নেমে গেল। ঐ যে তার টুপীটা হ্যাট্-স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে। ড্রইং-রুমে তরুণী তার মাকে সিনেমার গল্প বলছে।—মিঃ মিটার নাকি! আপনি যে বড় নীচে নেমে এসেছেন!—তরুণীর সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণদয়াল বললে—Going to have a breath of fresh air, Miss king.

দাঁড়ান না, I can accompany you, if you will—তরুণী হর্ষে বেরিয়ে আসে।

তার আগেই কৃষ্ণদয়াল বাইরে থেকে সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেকখানি পথ, টিলাটার ওপর পৌঁছতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। তার ওপর চড়াই-উৎরাই, পথটাও ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। মাঠের ওপর অন্ধকার থম্‌থম্ করছে। জায়গায় জায়গায় অর্দ্ধশায়িত নর-নারীর অস্ফুট ছায়ামূর্তি, চুপি-চুপি কথা। দরিদ্র শরীর তাদের কামুসে সংকোচ হয় বৈ কি, তাই প্রকৃতির এই উন্মুক্ত জ্যোতিটুকুর বদলে এদের অন্ধকারের অপেক্ষা করতে হয়। কৃষ্ণদয়াল হন্‌-হন্ করে এগিয়ে চলে। এইবার পথটা চেনা যাচ্ছে। ঐ যে লিভেন-গাছটা আগের মতই আপন একাকিতায় সমাহিত। কৃষ্ণদয়াল টিলাটার ওপর উঠে এলো। না—এদিক দিয়ে নয়, একটু ঘুরে সে ওদিক থেকে শীলার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। শুকনো পাতার ওপর চলার শব্দকে দমন করা যায় না। শীলা হয়তো তার দিকে ফিরে হেসে উঠবে। শীলাইতো, ঘাসের ওপর ঐতো আবছা দেখা যাচ্ছে তার জাম্পার। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কৃষ্ণদয়াল এগিয়ে যায়। কিন্তু কৈ শীলা! ঘাসের ওপর একখানা পুরোনো ছেঁড়া খবরের কাগজ হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে। শীলা নেই। কৃষ্ণদয়াল সমস্ত টিলাটা প্রদক্ষিণ করেও তাকে দেখতে পেলে না। ডাকলে, শীলা, শীলা, হ্যালো, where are you? উত্তর নেই। হয়তো শীলা এসেছিল, তার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ী ফিরে গেছে। কৃষ্ণদয়াল লিভেন-গাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো। ঠিক তারই মত হয়তো

শীলা এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল, অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, তারপর অভিমান করে চলে গেছে।

কৃষ্ণদয়াল গাছটাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। তার বুকের ভেতর বহিঃপ্রকাশের এক বিষাদ-ভরা আকুতি গুমরে গুমরে উঠছে। পথ, কোথায় পথ? অন্তর্নিবাসী স্মৃতির বেদনা একাকিতার পাষাণ প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরে।

সিডেন-গাছটা কাঁদে বুঝি। সে কী কান্না!

কলিকাতা,

ফাল্গুন, ১৩৪৮

৭

স্বপ্ন

প্রতিটি হৃদয়ের মধ্যে এক-একটি পৃথক্ কুঞ্চিকা মজুত থাকে কি না, তা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ আছে, কিন্তু একটি চাবির সংস্পর্শে যে একাধিক তালা বা কল নিতান্ত সহজে আত্মোন্মোচন করে, তার পরিচয় পাওয়া গেল লন্ডনে নভেম্বর মাসের ধূম-প্লাবিত একটি মধ্যরাত্রে।

আসলে ব্যাপারটাকে একটি নিখুঁত "আকাঙ্ক্ষা-পূর্তির" জীবন্ত উদাহরণ বলা চলে। অর্থাৎ বনবিহারী প্রতি রাত্রে আইভার-আস্টনের শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে যে-ধরনের একটি চিত্রের কল্পনা করে থাকে, সেদিনকার ঘটনাটা ঠিক সেই ধরনের। কল্পনার বিষয়বস্তু যে একটি নায়িকা এবং তাঁরই লীলাস্থল, একটি অদৃষ্ট-ও অজ্ঞাতপূর্ব বেড্-সিটিং রুম, তা বলাই বাহুল্য। বনবিহারী কলেজে বেরবার আগে তার বইপত্তর নিয়ে যখন

ঘরের মাঝখানের গজদুই খালি জায়গাটায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে, ঠিক সেই সময়েই দেখা যায়, পাকা চেরী রঙের পোষাক-পরা সঞ্চারিণী লতেব একটি তন্বী স্ট্রীম-লাইন গতিতে জানলার ফ্রেমটুকু অতিক্রম করে চলে গেল। বনবিহারী দোর খুলে বাইরে এসে তার পশ্চাদ্ধাবন করবার আগেই সে তার নাকের সামনে একখানা দোতালা বাসে উঠে পড়ে যেন ট্যাঙ্গোর তালে তালে দেহ দুলিয়ে ওপরের সিঁড়িগুলো দিয়ে উঠতে থাকে। বনবিহারীর প্রবাস-জীবনে এই ধরণের বাস ফেল করা নিত্যই ঘটে থাকে। তাই শীতের সন্ধ্যায় লেপ মুড়ী দিয়ে তাকে প্রায়ই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। বিছানায় শুয়ে সে তার মনোরথে সওয়ার হয়ে সটান গিয়ে হাজির হয় একেবারে তার প্রতিবেশিনীর বেড্-সিটিং রুমে, যখন মেয়েটি নাইট্-গাউন পরে তার চেস্ট্‌নাট রঙের চুলগুলো থেকে হেয়ার-পিন্‌টি খুলে দাঁতে চেপে ধরে হাতে-মুখে ক্রীম মাখছে। প্রতিদিনই শুতে যাবার আগে এই চিত্রটিকে নিবিষ্টভাবে উপভোগ করবার জন্যে বনবিহারীর মন সারাটি সন্ধ্যা উন্মুখ হয়ে থাকে। মেয়েটি বহুক্ষণ ধরে হাতে-মুখে ক্রীম মাখে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে ল্যাভেণ্ডার-জল সিঞ্চন করে, খোঁপা খোলে এক পাটি এক পাটি করে, তারপর আলোটা নিবিয়ে দেয় একটু যেন উত্তেজিতভাবে। এর পরেই বনবিহারীর পরীক্ষাপাঠক্লিষ্ট দেহ-মন ঘুমের কাক-চক্ষু জলের একেবারে তলায় নেমে যায়।

সেদিনকার ঘটনাটা এই চিত্রটিরই মোটামুটি একটি tableau vivant. অর্থাৎ সন্ধ্যায় বার-ডিনার ও সিনেমা সেরে বনবিহারী যখন রাত বারোটার সময়ে Russel Sq. স্টেশনে টিউব থেকে রাস্তায় উঠে এলো তখন সমস্ত লণ্ডন শহরটার চিহ্নমাত্র নেই। বিশ্বসৃষ্টির আদিযুগে যে বাষ্পীয় পদার্থ লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে শূন্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াতো, লণ্ডন শহরটা ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে গেছে। বনবিহারীর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ-চলা অভ্যাস ছিল বলেই সে তখন গোলাবী বেউড়ীর মত গাঢ়, চট্‌চটে কুয়াশার ভেতর দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কোনোরকমে নিজের বাড়ীর সম্মুখে এসে হাজির হলো। হ্যাঁ, এইটেই তো Burton St., কুয়াশার ভেতর থেকে যেন একটু আলো দেখা যাচ্ছে, তাহলে এইটেই তার বাড়ীর সামনের ল্যাম্প্-পোস্ট্। পকেট থেকে ল্যাচ্-কী বের করে দরজার ছিদ্রে প্রবেশ করাতেই যেন চিচিং-ফাঁকের মত যাদুবাক্যের প্রভাবে অনায়াসে সেটি হাট হয়ে খুলে গেল।

বাড়ীতে ঢুকেই ডানদিকে পথের ওপর তার ঘর। অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে একটু হাত বুলোতেই তার ঘরের দরজার নবটা একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরা দিলে, এবং মৃদু সম্মতির মত অস্ফুট শব্দ করে দরজাটাও একপাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর বাঁ-দিকের কোণে সুইচ। বনবিহারীর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো।

শক্ লেগে নয়। দপ্ করে আলোটা জ্বলে উঠতেই সে দেখলে তার ঘরখানা একেবারে আগা-পাশতলা বদলে গেছে, তার

বইয়ের আলমারীর জায়গায় চমৎকার একটি প্রসাধন-মুকুর, আগুনের ধারের তার অত আরামের সোফাটার জায়গায় একটা রঙীন ঘেরাটোপ-ঢাকা সেটী, তার ওপর তুলতুলে, চুপচুপে গোটাকয়েক কুশন, ঘরের একপাশে একটা তিনপায়া টেবিলের ওপর রোমান নাভারো ধাঁচের কয়েকজন পুরুষের ফটো, এবং জানলার কাছে অলস্যে আদর-দেওয়া পর্দাটার নীচে ছোট্ট বাহারে খাটখানার ওপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন তারই প্রতিবেশিনী, সেই স্ট্রীম-লাইন-গতি-চঞ্চলা, চেস্ট্‌-নাট-চিকুর-শোভিনী ছলনাময়ী!

বনবিহারী এতদিন ধরে যে অসম্ভব সম্ভাব্যের কথা আপন কল্পনায় ফেনিয়ে ফেনিয়ে বানিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে এসেছে, তার ঐ মরচেপড়া কুঞ্চিকাটির প্রসাদে তা-ই আজ এমন অকস্মাৎ অতর্কিতরূপে বাস্তব হয়ে উঠলো। এবং বনবিহারী তার স্নায়ুমণ্ডলীর আঁতে-কোণে যেখানে যতটুকু সাহস আছে, সবটুকু একত্র করে মেয়েটির জেগে-উঠার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রূপ-কথার নিদ্রিত রাজকন্যা এবং সোণার কাঠি, রূপোর কাঠি প্রভৃতির উপমা-বহুল কাব্য-ভাবও যে তার ভাবপ্রবণ মনে উদিত হলো না, এমন নয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার তিতিক্ষার বিচ্যুতি ঘটলো। এবং উক্ত রাজকন্যাকে সোণার কাঠি বা অন্য কোনো উপায়ে জাগরিত করবার উদ্দেশ্যে সে পালঙ্ক-অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

আমাদের এই Prince Charming-টি যখন আস্তে আস্তে তার Sleeping Beauty-র ওপর ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে তার পা লেগে খাটের তলায়-রাখা এক গেলাস জল উল্টে পড়ে ঘরখানা ভাসিয়ে দিলে। সেটা তাড়াতাড়ি তুলতে গিয়ে তার নজরে পড়লো গেলাসের ভেতর দু-সারি দাঁত তার দিকে নিজেদের মেলে ধরে নিঃশব্দ অট্টহাস্যে তার প্রেম-বাসনার প্রতি কুৎসিত কটাক্ষ করছে।

বনবিহারী আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। চাবিটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে ঘন বার্নিশ মত মেঘের ভেতর পা ঢাকা দিয়ে লন্ডনের পথে পথে সারা রাত নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো।

কলিকাতা,
২২শে আষাঢ়, ১৩৪৯